DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

DEPT. OF HISTORY

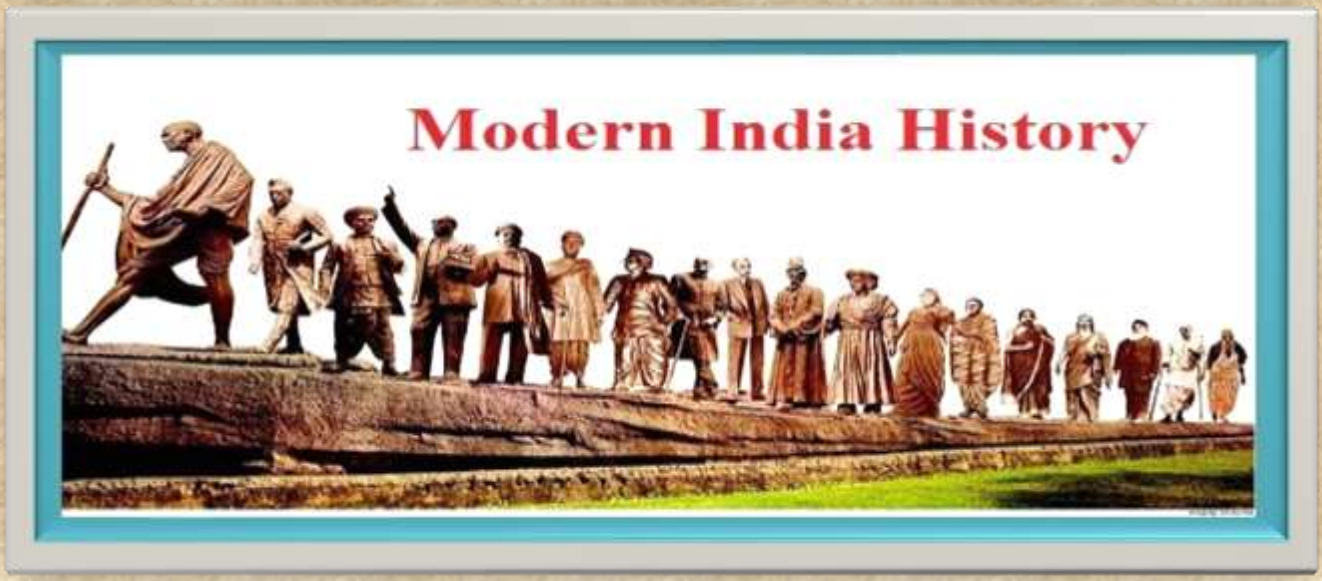

STUDY MATERIAL FOR 4th SEMESTER STUDENTS

SUBJECT – HISTORY (GENERAL)

PAPER- CC-4/GE-4

HISTORY OF INDIA: 1707 – 1950 A.D.

UPLOADED FOR D.C.H. COLLEGE 4th SEM STUDENTS IN LOCKDOWN PERIOD

4TH SEMESTER TUTORIAL QUESTIONS FOR – 2020

HISTORY GENERAL – CC-4/GE-4

"ক" বিভাগ

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **1 X 5 = 5**

1. 1764 সালের বক্সার যুদ্ধের তাৎপর্য কি ছিল?
2. ভারতীয় অর্থনীতির উপর রেলপথ প্রচলনে প্রভাব আলোচনা কর।
3. মহারানীর ঘোষণাপত্রের (1858) তাৎপর্য কি ছিল?
4. অবশিল্পায়ন বলতে কী বোঝ?
5. "সেফটি ভাল্ব তত্ত্ব" কি?
6. নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে টীকা লেখ।
7. স্বরাজ্য দল কেন গঠিত হয়?
8. চৌরিচৌরা ঘটনার তাৎপর্য কি ছিল?
9. মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের গুরুত্ব
10. তেভাগা আন্দোলন
11. মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা
12. ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ।

"খ" বিভাগ

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **1 X 10 = 10**

1. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষি অর্থনীতির উপর কি প্রভাব ফেলেছিল?
2. 1857 সালের মহাবিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
3. রামমোহন রায়কে কি "আধুনিক যুগের পথিকৃৎ" বলা যায়?
4. শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন কর।
5. পলাশীর যুদ্ধোত্তর কালপর্বে কি "সম্পদের নিষ্ক্রমণ" ঘটেছিল?
6. 1885 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা কর।
7. স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা গুলি কি ছিল? স্বদেশী আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতি আলোচনা কর।
8. আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের তুলনামূলক আলোচনা কর।
9. দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে(1919 -1939) ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বিবরণ দাও।
10. 1942 খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।
11. ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা আলোচনা কর।
12. 1947 সালের ভারত বিভাজন কি অনিবার্য ছিল?

Tutorial Project জমা দেওয়ার তারিখ পরে জানানো হবে। জমা দেওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের যেকোনো **Semester এর Admit** অথবা **Registration** আনতে হবে।

HISTORY. CC-4/GE-4 (GENERAL)
HISTORY OF INDIA* (1707 - 1950)
OBJECTIVE QUESTIONS:

① ঔরঙ্গজেব কতসালে মারা যান? পরবর্তী মোঘল সম্রাট কে ছিলেন?
ঔরঙ্গজেব 1707 সালে মারা যান, পরবর্তী মোঘল সম্রাট ছিলেন প্রথম বাহাদুর শাহ। (1707-1712)

② নাদির শাহ কতসালে ভারত আক্রমন করেন? এর ফল কি হয়েছিল?
1738-39 সালে নাদির শাহ ভারত আক্রমন করেন, এই আক্রমনের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়, তখন মোঘল সম্রাট ছিলেন মহম্মদ শাহ

③ প্রথম তিনজন পেশোয়ার নাম লেখো,
প্রথম তিনজন প্রাচীন পেশোয়া হলেন ① বালাজী বিশ্বনাথ ② প্রথম বাজীরাও ③ বালাজী বাজীরাও

④ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কতসালে কাদের মধ্যে হয়েছিল? এর ফল কী হয়েছিল?
1761 সালে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও এর নেতৃত্বাধীন মারাঠা বাহিনীর সাথে আহমদ শাহ আবদালীর মধ্যে সংঘটিত হয়, মারাঠারা পরাজিত হলে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের আশা বিলুপ্ত হয়েছিল,

⑤ সলবাই এর সন্ধি ও বেসিনের সন্ধি কবে স্বাক্ষরিত হয়?
1782 সালে সলবাই এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়,
1802 সালে মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবং ইংরেজদের মধ্যে বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়,

⑥ 'ভারতীয় মহাসনদ' কে, কাকে দিয়েছিলেন?
মোঘল সম্রাট ফাররুখশিয়ার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়েছিলেন 1717 সালে, এই সনদলাভের ফলে বাংলা দেশে কোম্পানীর বানিজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়,

⑦ আলিনগরের সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে 1757 সালের 9th Feb ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়,

8) ভারতের ইতিহাসে 1765 ও 1833 খ্রিস্টাব্দের গুরুত্ব কী?
1765 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে,
1833 সালের Chater Act দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের অবসান ঘটে,

9) বক্সারের যুদ্ধ কবে ও কাদের মধ্যে হয়?
1764 সালে বাংলার নবাব মীরকাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের মিলিত বাহিনীর সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ হয়,

10) কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট কবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
1774 সালে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এলিজা ইম্পে, তিনি মহারাজ নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ড দেন,

11) কে, কবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন?
1793 সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় জমিদারদের জমির স্থায়ীত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে।

12) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (1792) কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, এরপর 1799 সালে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধচলাকালে টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়,

13) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক (কে) কোন (দেশীয় রাজা) প্রথম গ্রহণ করে?
লর্ড ওয়েলেসলী 1798 সালে অধীনতামূলক মিত্রতানীতি প্রবর্তন করেন, হায়দ্রাবাদের নিজাম এতে প্রথম স্বাক্ষর করেন,

(14) 'অমৃতসরের সন্ধি' (1809) কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
1809 সালে রণজিৎ সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত, শতদ্রু নদীকে রণজিৎ সিং-এর রাজ্যের পূর্বসীমানা বলে মেনে নেন।

(15) 'খালসা' বলতে কী বোঝায়? কে শিখদের মধ্যে খালসা প্রবর্তন করেন?
খালসা হল শিখজাতি কর্তৃক গৃহীত উন্নত অনুশাসন ও সামরিক সংগঠন। শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং খালসা প্রবর্তন করেন।

(16) 'দস্তক' বলতে কী বোঝায়?
'দস্তক' হল একধরনের বাণিজ্যিক ছাড়পত্র, 1717 সালের ফারুকশিয়রের সনদ দ্বারা কোম্পানী বাংলায় বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্যের ছাড়পত্র বা দস্তক লাভ করে, পরে কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দস্তক দেখিয়ে বাংলার শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে।

(17) ফরাজী আন্দোলনের দুজন নেতার নাম কর ও বিদ্রোহের প্রধান আদর্শ কি ছিল?
হাজী শরিয়তউল্লাহ ও দুদু মিঞা ছিলেন ফরাজী আন্দোলনের দুইনেতা।
ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার দূর করা ও ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধন ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

(18) সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল? দুজন নেতার নাম কর।
1855 সালে সাঁওতাল উপজাতিদের মধ্যে রাজমহল এলাকায় এই বিদ্রোহ হয়, দুজন নেতা ছিলেন সিধু ও কানু।

(19) নীলবিদ্রোহ কবে, কোথায় হয়েছিল? এই বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম কর।
1859-60 সালে বাংলা ও বিহারে নীল বিদ্রোহ হয়, এই বিদ্রোহের দুই নেতা হলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস

(20) কোন বিখ্যাত গ্রন্থে নীলকর সাহেবদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে? এই গ্রন্থ কে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন?

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নীল বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রেভারেন্ড জে. লং সাহেবের অনুরোধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তা ইংরেজী অনুবাদ করেন।

(21) ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি ছিল? ভারতে এই আন্দোলনের দুজন নেতার নাম কর।

এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ, 'দার-উল-হারব' ভারতকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করা। ভারতে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন শাহ-ওয়ালি-উল্লাহ ও তিতুমীর।

(22) স্বত্ববিলোপ নীতির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? কে এই নীতি প্রয়োগ করেন?

স্বত্ববিলোপ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো। লর্ড ডালহৌসী এই নীতি প্রয়োগ করেন।

(23) শেষ মোগল সম্রাট কে ছিলেন? তিনি কোথায় মারা যান?

শেষ মোগল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, তিনি নির্বাসিত অবস্থায় রেঙ্গুনে মারা যান।

(24) ব্রাহ্মসমাজের দু'জন নেতার নাম কর।
① দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ② কেশবচন্দ্র সেন

(25) প্রার্থনা সমাজ ও আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
প্রার্থনা সমাজ - আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ
আর্যসমাজ - দয়ানন্দ সরস্বতী

(26) স্বামী বিবেকানন্দ রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
① পরিব্রাজক ② বর্তমান ভারত ③ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

৭) হিন্দু কলেজ কত খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়? প্রতিষ্ঠাতাদের দুই জনের নাম লেখ।
1817 সালে হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন হাইড ইস্ট, ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

৮) ভারতমাতার ছবির শিল্পীর নাম লেখো।
(1) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (2) নন্দলাল বসু

৯) 1854 সালে শিক্ষা ডেসপ্যাচ কে পাঠিয়েছিলেন? তিনি কোন পদে ছিলেন?
চার্লস উড ছিলেন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি, 1854 সালে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে 'উডের নির্দেশনামা' (Wood's Despatch) নামে নির্দেশনামা পেশ করেন।

১০) হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
হিন্দু প্যাট্রিয়ট = হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অমৃতবাজার পত্রিকা - শিশির কুমার ঘোষ

১১) বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা আছে?
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা 1770 সালের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে।

১২) নব্যবঙ্গদের প্রকাশিত একটি পত্রিকার নাম
(1) পার্থেনন (1830) (2) জ্ঞানান্বেষণ (1831) (3) বেঙ্গল স্পেক্টেটর

১৩) কে, কোথায় এবং কবে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে?
ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় 1784 সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়।

১৪) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি? ... পত্রিকার উদ্যোক্তা কারা। সমাচার দর্পণ, শ্রীরামপুর থেকে

প্রকাশিত হয় –
সংবাদ প্রভাকর – ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
তত্ত্ববোধিনী – দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(35) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থাপিত হয়? প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার কে ছিলেন?
1857 সালের 24th January কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন জেমস্ উইলিয়াম কোলভিল,

(36) জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে দুটি রাজনৈতিক সংগঠনের নাম লেখ
① ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন – (1876)
② মাদ্রাজ মহাজন সভা – (1884)

(37) কবে, কোথায়, কার সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়,
1885 সালে 28শে ডিসেম্বর বোম্বাই এর গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে, প্রথম সভাপতি ছিলেন বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(38) তিনজন চরমপন্থী নেতার নাম লেখ,
① লালা লাজপত রায়
② বাল গঙ্গাধর তিলক
③ বিপিনচন্দ্র পাল

(39) কবে, কোথায় মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়?
1906 সালে ঢাকা শহরে ~~[illegible]~~ ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর বাগানে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়,

(40) কবে, কোন লর্ডের সময় বঙ্গভঙ্গ করা হয় এবং কোন সালে, তা বাতিল করা হয়,
1905 সালের 16th Oct বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করা হয়,
1911 সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়,

41. 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকা কোন ভাষায় প্রকাশিত হয়? এই দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদক কে ছিলেন?
বাল গঙ্গাধর তিলক 'কেশরী' ও 'মারাঠা' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই দুটি সংবাদপত্র মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

42. কে ও কেন 'গণপতি' ও 'শিবাজী' উৎসবের সূচনা করেন?
ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসবের সূচনা করেন।

43. বাংলাদেশের দুটি গুপ্তসমিতির নাম কর।
① অনুশীলন সমিতি ② যুগান্তর সমিতি

44. হোমরুল লীগের দু'জন নেতার নাম কর।
1916 সালে প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগের দুজন নেতা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ত।

45. গদর পার্টি কোথায় ও কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়?
'গদর' কথার অর্থ হল বিপ্লব। 1913 সালে আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরে প্রবাসী ভারতীয় [illegible] গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করে।

46. স্বরাজ্য দলের দুইজন নেতার নাম কর
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু

47. কবে ও কাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
1916 সালে মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

48. রবীন্দ্রনাথ কবে ও কেন 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন?
1919 সালের 13th April জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরেজ বাহিনীর গুলিচালনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

(49) খিলাফৎ আন্দোলন কবে হয়েছিল? এই আন্দোলনের দু'জন নেতার নাম কর।
1920 সালে খিলাফৎ আন্দোলন হয়েছিল, এই আন্দোলনের দুজন নেতা ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী ও মৌলানা সৌকত আলী।

(50) কতসালে এবং কোন অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করে?
1929 সালে লাহোর অধিবেশনে নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করে।

(51) 'খুদা-ই-খিদমদগার' কথার অর্থ কি? এই দলের নেতা কে ছিলেন?
'খুদা-ই-খিদমদগার' কথার অর্থ হল ঈশ্বরের সেবক, এই দলের নেতা ছিলেন খান আব্দুল গফফর খান বা সীমান্ত গান্ধী।

(52) 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' বা 'Communal Award' কাকে বলে?
1932 সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' বা 'Communal Award' ঘোষণা করেন, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর ব্যবস্থা করেন।

(53) কবে, কোথায় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়?
1940 সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়, এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ আলী জিন্না।

(54) 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' কত খ্রিস্টাব্দে ও কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়?
1931 সালে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট আরউইনের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এই চুক্তি অনুসারে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হন।

55) গান্ধী সম্পাদিত দুটি পত্রিকার নাম লেখো।
গান্ধী সম্পাদিত দুটি পত্রিকা হলো হরিজন ও ইয়ং ইন্ডিয়া,

56) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কবে ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
1920 সালের 17th oct [illegible] তাসখন্দ শহরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে 1925 সালের 25th Dec কানপুরে ভারতের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে,

57) কত সালে ও কার নেতৃত্বে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়,
1930 সালের 18th April বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়,

58) ত্রিপুরী কংগ্রেসে কে সভাপতি নির্বাচিত হন ও কাকে পরাজিত করেন?
1939 সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করেন,

59) আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহিলা বাহিনীর নাম কি ছিল ও এর নেত্রী কে ছিলেন?
আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহিলা বাহিনীর নাম ছিল ঝাঁসির রানী ব্রিগেড, এর নেত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সায়গল)

60) 'কাইজার-ই-হিন্দ' ও 'কায়েদ-ই-আজম' নামে কারা পরিচিত?
কাইজার-ই-হিন্দ - মহাত্মা গান্ধী
কায়েদ-ই-আজম - মহম্মদ আলী জিন্না

61) কবে, কোথায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় এবং কে প্রধানমন্ত্রী হন,
1946 সালের 2nd Sept ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু,

(62) ভারতীয় নৌবিদ্রোহ কবে ও কোথায় শুরু হয়?
1946 সালের 18th Feb মুম্বাইয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর তলোয়ার জাহাজে নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়।

(63) ভারতের ~~প্রথম~~ শেষ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় কে ছিলেন?
ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী।

(64) গণপরিষদ কবে গঠিত হয় ও ভারতীয় সংবিধান রচনা কবে শেষ হয়?
স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা হল বি. আর. আম্বেদকর, [illegible] গণপরিষদ গঠিত হয়, ঐ সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন বি. আর. আম্বেদকর। 1950 সালের 26th January এই সংবিধান কার্যকর হয়।

(65) স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
প্রথম প্রধানমন্ত্রী — জওহরলাল নেহেরু
প্রথম রাষ্ট্রপতি — ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ

* * * * * *

* ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের কারন ও ফলাফল আলোচনা কর।

ভূমিকা: ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেলপথ [illegible] ভারতবর্ষে আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক [illegible] পরিবর্তন আসে, কার্ল মার্কসের মতে "The railway system will become in India truly the forerunner of modern Industry" [illegible]

রেলপথ প্রবর্তনের প্রাথমিক ইতিহাস *

[illegible] গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী [illegible] ১৮৫৩ [illegible]

১৮৫৪ সালে [illegible]

[illegible]

প্রকৃত কারন *

① [illegible]
② [illegible]
③ [illegible]
④ [illegible]

কিন্তু [illegible]

[illegible]

[illegible]

গ্যারান্টি প্রথা*

প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতবাসীর অনিচ্ছার কারণে রেলপথ নির্মাণে বিদেশী কোম্পানীগুলো কোনরূপ উৎসাহ দেখায়নি, এই পরিস্থিতিতে সরকার রেলপথ নির্মাণের জন্য 'গ্যারান্টি প্রথা' চালু করে। এই প্রথায় রেলপথ নির্মাণের জন্য [illegible] সরকার রেলপথ নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে জমি দেয়। কোম্পানীগুলি রেলপথ নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ [illegible] 5% হারে সুদ দেওয়া হত, [illegible] সরকার ও কোম্পানীগুলি [illegible] দেওয়া হত। [illegible] 1905 সালে রেলওয়ে বোর্ড গঠন করে তার উপর রেলপথ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়, 1925 খ্রীঃ থেকে দেশের সাধারণ বাজেট ও রেল বাজেট পৃথক করে দেওয়া হয়।

রেলপথ প্রবর্তনের ফলাফল*

সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে [illegible] রেলপথ [illegible] ভারতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে [illegible] "The Construction of railways had a revolutionary impact on the life, culture and economy of the Indian people" রেলপথ প্রবর্তনের ফলাফলগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি—

সুফল*

(i) জাতীয়তাবোধের বিকাশ: রেলপথে যোগাযোগ [illegible] ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের [illegible] ভাষা, ধর্ম ও গোষ্ঠীগত [illegible] ভারতীয় জাতীয়তা [illegible]

(ii) বাণিজ্যের সম্প্রসারণ: দেশের বিভিন্ন প্রান্তে [illegible]

পূর্ন স্বাধীন ভাবে [illegible] সুযোগ দেওয়া হয়,

* তৃতীয়ত:- কোম্পানি এদেশের থেকে বাণিজ্যের [illegible] — লবণ, সুতা, আফিম, নীল, চিনি ইত্যাদি [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য পায়,

* চতুর্থত:- কোম্পানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

* পঞ্চমত: - কোম্পানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমৃদ্ধ হয়,

* ষষ্ঠত:- ভারতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পদ [illegible] [illegible],

* সপ্তমত: - কোম্পানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1897 সালে [illegible] [illegible] [illegible] 70 হাজার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

কুফল ** দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "সম্পদের বহির্গমন" (Drain of Wealth) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

* দ্বিতীয়ত: কোম্পানি [illegible]

* তৃতীয়ত:* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সমাজে ভারতীয়দের অপমান করা হত।

* চতুর্থত: রোকেয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে [illegible] অসাধারণ ছিল [illegible] নারী শিক্ষার উন্নতি হওয়া [illegible] না, তাঁর উদ্দেশ্য [illegible] করা হত না।

* পঞ্চমত: রোকেয়া মুসলমানের [illegible] পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু রোকেয়া [illegible] সমাজের নারী ও পুরুষের [illegible] [illegible] পরিবর্তন ও [illegible] অতি [illegible]।

* ষষ্ঠত: রোকেয়া [illegible] হলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে যায়, [illegible] [illegible] নারীর মান ও [illegible] [illegible] হয় নাই।

* সপ্তম: রোকেয়ার [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রোকেয়ার [illegible] করে।

উপসংহার * [illegible] রোকেয়া [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] শিক্ষা, [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা হলেও রোকেয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রোকেয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় যায়; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় যায়, [illegible] হয়।

— o —

*ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা :– *

ভূমিকা* 1765 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৎকালীন মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের (অধিকার) বা দেওয়ানীলাভের অধিকার পায়। এরপর কোম্পানী রাজস্ব সংক্রান্ত নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করে। 1770 সালের মন্বন্তরের পর ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনব্যবস্থা বাতিল করে ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। তিনি একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করে কালেক্টরদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় শুরু করেন এবং জমিদারদের সাথে পাঁচবছর মেয়াদী বন্দোবস্ত করেন। কোম্পানী এই বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলে 1777 সালে হেস্টিংস 'একসালা বন্দোবস্ত' চালু করেন। কিন্তু এতেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, কারণ জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হন। কোম্পানী, জমিদার ও কৃষক সকলেরই নানা অসুবিধা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই অবস্থায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা জমিদারদের সাথে স্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত* আলেকজান্ডার ডাও, হেনরী পেটুলো, টমাস ল, ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ কোম্পানীর পরিচালক সভার কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করেন। 1784 সালের পিটের ভারত শাসন আইনে এর পক্ষে সুপারিশ করেন। পরিচালকসভার অনুমতি লাভের পর লর্ড কর্নওয়ালিস 1793 সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে

বৈশিষ্ট্য = (1) জমিদাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করলে বংশানুক্রমিক ভাবে জমিদারী ভোগ করতে পারতেন।
(2) নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে ঐ জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হত এবং নতুন করে নিলাম করা হত।
(3) বন্যা, খরা, মহামারী বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ও রাজস্ব মুকুব করা হত না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল্যায়ন* বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। ঐতিহাসিক মার্শম্যান লিখেছেন "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল একটি সাহসিকতাপূর্ণ ও বিজ্ঞান পদক্ষেপ" ("It was a bold, brave and wise measure") [illegible] দত্তের মতে" [illegible] আদানে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত", চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

(১) জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণ ও আদায়ের তারিখ নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত [illegible]

(২) রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট থাকায় সরকারের আয়ের হিসাব করা সহজ হয়।

(৩) [illegible] জমির মালিকানা পাওয়ার ফলে তারা [illegible] জমিদারী বন্দ, জমির উন্নয়ন ও কৃষির [illegible] [illegible] হয়।

(৪) নতুন [illegible] অনুযায়ী [illegible] জমিদারদের [illegible] থেকে মুক্তি পায়।

(৫) বাংলার [illegible] ইংরেজ অনুগত [illegible] জমিদারশ্রেণীর [illegible] হাত থেকে [illegible] সাম্রাজ্যের [illegible]

(৬) [illegible] কৃষির [illegible] উন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল * তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত ছিল না। T.R. Homes এর মতে "The permanent settlement was a sad blunder"

(১) **রায়তদের দুর্দশা** * চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকারের সঙ্গে রায়তের কোনো সম্পর্ক ছিল না, [illegible] জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হলেও [illegible] ও জমিদারের [illegible] [illegible] কোন চুক্তিপত্র করেনি, ফলে জমিদারগণ [illegible] ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি [illegible] জমি থেকে উচ্ছেদ করতেন, [illegible] "It gave a blank cheque to the zamindars" জমিদাররা নানারকম [illegible] কৃষকদের কাছ থেকে [illegible] আদায় করতেন, [illegible] জমিদাররা সরকারকে 35 লক্ষ টাকা [illegible] কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করত [illegible] 35 লক্ষ টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করেছেন।

(২) **জমিদার পরিবারগুলির উচ্ছেদ** * চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সূর্যাস্ত আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সরকারী [illegible] জমা দিতে না পারায় বহু প্রাচীন জমিদার [illegible] হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু 20 বছরের [illegible] [illegible] [illegible] জমিদারি [illegible] "How permanent was

Permanent Settlement ?"

নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব* [illegible]

[illegible]

[illegible]* [illegible]

[illegible]

[illegible]* [illegible]

[illegible]

পত্তনি প্রথা* [illegible]

[illegible] "The settlement destroyed the old village Community, Changed the property relations, Created a new social Class and Caused a social revolution in the Indian Country side."

[illegible]* [illegible] 1820 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1822 [illegible]

[illegible]

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অপারসীম। (১) পলাশির যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, বক্সারের যুদ্ধে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি।[১] পলাশিতে কূটনীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা এক অনভিজ্ঞ নবাবের ওপর জয়যুক্ত হয়—এই জয় ছিল আকস্মিক ও অনায়াসলব্ধ। তাই এর স্থায়িত্ব সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন দিল্লির বাদশা-সহ দু'জন ভারতীয় নৃপতি। তাই এই যুদ্ধ হল চূড়ান্ত ফল-নির্ণয়কারী যুদ্ধ। ***ম্যালেসন*** (Malleson) বলেন যে, "ভারতে বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহগুলির মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ হল একটি চূড়ান্ত ফল-নির্ণয়কারী যুদ্ধ।"[২] ঐতিহাসিক ***স্মিথ*** (Smith)-এর মতে, "পলাশি ছিল কয়েকটি কামানের লড়াই, বক্সার ছিল চূড়ান্ত বিজয়।"[৩] ঐতিহাসিক ***বিপান চন্দ্র***-র মতে, "ভারতের ইতিহাসে বক্সারের এই যুদ্ধটি ছিল সর্বাধিক যুগান্তকারী ও তাৎপর্যময়।"[৪]

**বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব : চূড়ান্ত যুদ্ধ*

(২) এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা ও ইংরেজদের সামরিক বলের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের দ্বারা বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নবাব সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির হাতের পুতুলে পরিণত হন। মিরকাশিমের সঙ্গে বিবাদ শুরু হলে কোম্পানি এক চুক্তির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়বারের জন্য মিরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায় (১৭৬৩ খ্রিঃ)। তখন স্থির হয় যে, নবাবের দরবারে একজন স্থায়ী ইংরেজ প্রতিনিধি থাকবেন, নবাবের সৈন্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং লবণের ওপর আড়াই শতাংশ ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া, তিনি নানা কারণে কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে

বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য

---

১. "Buxar deserves far more than Plassey to be considered as the real origin of the British power in India."—James Stephen.

২. "Buxar takes the rank amongst the most decisive battles of India."

৩. "Plassey was a cannonade but Buxar was a decisive battle."—*Oxford History of India*, P. 147.

4. "This was one of the most decisive battles of Indian History."—*Modern India*, P 73

সম্মত হন। বক্সারের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মিরজাফরের মৃত্যুর (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৬৫ খ্রিঃ) পর তাঁর নাবালক পুত্র নজম্‌উদ্দৌলা-কে সিংহাসনে বসানো হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি এক চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি নবাবের সামরিক ও প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা হস্তগত করে এবং তিনি কোম্পানির বৃত্তিভোগী পুতুলে পরিণত হন। এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জনৈক বিচারপতি বাংলার নবাবকে 'এই ছায়া, এই খড়ের পুতুল' ('this phantom, this man of straw') বলে অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক ***র‍্যামসে ম্যুর*** (Ramsay Muir) বলেন যে, "বক্সার বাংলার ওপর কোম্পানির শাসনের শৃঙ্খল চূড়ান্তভাবে স্থাপন করে।"[১]

(৩) বক্সারের যুদ্ধে কেবল মিরকাশিম-ই নয়—অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লিশ্বর শাহ্ আলম পরাজিত হন। এর ফলে এক রকম বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা কোম্পানির হস্তগত হয়। অযোধ্যার নবাব কোম্পানির অনুগত মিত্রে পরিণত হন এবং 'নামসর্বস্ব' মোগল বাদশা কোম্পানির বৃত্তিভোগী হন। এইভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান রচিত হয়। ***স্যার আলফ্রেড লায়াল*** (Alfred Lyall) বলেন যে, "এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজ শক্তি উত্তর ভারতে অনুপ্রবেশ করে।"

উত্তর ভারতে আধিপত্যের সূচনা

(৪) বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলার বাণিজ্য ও অর্থনীতির ওপর কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বুকে শুরু হয় কোম্পানির কর্মচারীদের অবাধ ও নির্লজ্জ শোষণ ও লুণ্ঠন। অপরাপর ইওরোপীয় বণিকরা বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং দেশীয় বণিকদের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়।

বাংলার অর্থনীতিতে আধিপত্য

(৫) এই যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। এতদিন পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য স্থাপন, সার্বভৌমত্ব বা রাজস্ব আদায়ের কোনও বৈধতা ছিল না। দেওয়ানি অর্জনের মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য আইনগত বৈধতা লাভ করে।

দেওয়ানি লাভ

❖ **প্রশ্ন (৩) :** ***নীলবিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।*** [illegible]
অথবা, নীলবিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব বর্ণনা কর। [illegible]
অথবা, কেন নীল বিদ্রোহ ঘটেছিল? [illegible]
অথবা, 'নীলবিদ্রোহ' কি? ভারতে গণজাগরণে নীলবিদ্রোহের প্রভাব আলোচনা কর। [illegible]

■ **উত্তর :** মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে (১৮৫৭) ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের অসন্তোষ নিরসনের জন্য শাসন কাঠামোতে নানা পরিবর্তন ঘটালেও ভারতীয়দের ক্ষোভ দূর করতে পারেন নি। মহাবিদ্রোহের মাত্র দু'বছর পরে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলবিদ্রোহ শুরু করে। তার কিছুদিন পর শুরু হয় দাক্ষিণাত্য কৃষক বিদ্রোহ। তবে নীলবিদ্রোহের মূল লক্ষ্য জমিদার ও মহাজন সম্প্রদায় নয়, অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা।

পটভূমিকা

সুদূর অতীতে এদেশে নীলের চাষ হত।* **লুই বোনার্ড** নামে এক ফরাসী বণিক ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে নীল চাষ শুরু করেন। তারপর **কার্ল ব্ল্যাম** এদেশে প্রথম **নীল শিল্প** গড়ে তোলেন। ১৭৮০-১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নীল উৎপাদনে ভারতের স্থান সারা বিশ্বে প্রথম ছিল। ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় উৎপাদিত নীল সারা বিশ্বের চাহিদা পূরণ করেছিল। '১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্টে' নীল চাষকে ইউরোপীয়দের কাছে উন্মুক্ত করা হলে কোম্পানী ছাড়াও বহু বেসরকারী ইংরাজ কর্মচারী ও কোম্পানীর কর্মচারীরা অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীল চাষে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারণ নীল চাষে শতকরা ১০০ ভাগ লাভ হত।

কিন্তু নীলকর সাহেবরা লাভের অঙ্ক বাড়ালেও বাংলার লক্ষ-লক্ষ দীনদরিদ্র হতভাগ্য কৃষকরা সর্বহারা হয়ে ছিল। তাই দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নীলবিদ্রোহ রূপে। এই বিদ্রোহের পিছনে বহু কারণ লক্ষ্য করা যায়—

নীলবিদ্রোহের কারণ :

● **প্রথমত:** নীলকর সাহেবরা নীল চাষের জন্য দু-প্রকার জমি ব্যবহার করতেন। এই দুই প্রকার জমি হল—(ক) **এলাকা** ও (খ) **বে-এলাকা**। নীলকরদের নিজেদের কেনা জমিকে **'এলাকার'** জমি বলে। এই জমিতে দিনমজুর লাগিয়ে তারা নীল চাষ করাত। **'বে-এলাকার'** জমি হল কৃষকের জমি। এই জমিতে নীল চাষ করানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষককে বিঘাপ্রতি ২ টাকা "দাদন" বা অগ্রিম দিত। দরিদ্র কৃষকরা অভাবের দায়ে দাদনের মারণফাঁদে পা দিত। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষককে চরম বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যখন নদীয়া, যশোর, খুলনা, ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে নীলকুঠির সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। এক হিসাবে দেখা গেছে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় নীলকুঠির সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ফলে নীল চাষের জমি যে ক্রমশঃ বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। পাশাপাশি নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নীলচাষের পদ্ধতি

● **দ্বিতীয়ত:** নীলচাষ নীলকর সাহেবদের কাছে লাভজনক হলেও কৃষকের কাছে তা অলাভজনক। আর নীল একবার চাষ করলে সে জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ভালো হত না। তার উপর দাদনের ঋণজালে বন্দী কৃষকের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে। বাংলার কৃষকরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। কৃষকরা এই সর্বনাশা নীল চাষে অসম্মত হলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছিল। কৃষকদের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধির ইহা আর একটি কারণ।

দাদন প্রথা

---

* নীলগাছ একটি গুল্মজাতীয় বৃক্ষ। এর উচ্চতা চার/পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়। নীলগাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম **"ইন্ডিগোফেরা টিঙ্কটোরিয়া"** (Indigofera Tinctoria)। পাটগাছের মত জলে পচিয়ে নীলগাছ থেকে নীল উৎপাদন করা হয়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে নীলচাষের উল্লেখ আছে।

● **তৃতীয়ত:** অনিচ্ছুক কৃষকদের নীলকর সাহেবরা তাদের নীলকুঠিতে ধরে এনে **"শ্যামচাঁদ"** (চামড়া জড়ানো চাবুক) দিয়ে পেটাত। শুধু তাই নয়, অনিচ্ছুক নীলচাষীদের গরু-বাছুর, কৃষিজ সরঞ্জাম ইত্যাদি লুঠ করত। এমন কি কৃষকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করত এবং বাড়ির মেয়েদের সম্মানহানি করত। শুধু দীন-দরিদ্র কৃষকরা নয় এলাকার অবস্থাপন্ন মানুষ ও জমিদার সম্প্রদায় এই অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তাই নীল বিদ্রোহের প্রাক্কালে অসন্তোষ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে দানা বেঁধেছিল।

প্রজাপীড়ন

● **চতুর্থত:** ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক **"পঞ্চম আইন"** বা Regulation-V পাশ করেন। এর ফলে নীলকরদের সঙ্গে নীলচাষীদের নীলচুক্তি ভঙ্গকে ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। **ডঃ সুপ্রকাশ রায়** তাঁর **'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'** গ্রন্থে বলেছেন, আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের চেয়েও শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে নীলকর সাহেবদের স্বার্থে নীলচাষীকে সর্বস্ব উজাড় করে নীল চাষ করতে হত। মেক্‌লের মতে, "নীলচুক্তিগুলি নীতিগতভাবে অত্যন্ত আপত্তিকর, একদিকে নীলচুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকর সাহেবদের হিংসাত্মক ও বেআইনী কাজের ফলে কৃষকরা প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল।" সেই কারণে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে **"পঞ্চম আইন"** বাতিল হয়। তা সত্ত্বেও পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় নীলকর সাহেবরা বেআইনী জুলুম অব্যাহত রেখেছিল।

দমনমূলক পঞ্চম আইন

● **পঞ্চমত:** নীলচাষীদের উপর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আইন (১৮৩৫) পাশের পর বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট **জে. এইচ. ম্যাংগলর্স** (১৮৫৫) ও কলারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট **আবদুল লতিফ** (১৮৫৪) নীল সংক্রান্ত মামলার সময় চাষীর পক্ষ অবলম্বন করায় নীলচাষীরা বিদ্রোহের প্রেরণা পেয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট **অ্যাশলি ইডেন** এক ইস্তাহারে জানিয়ে দেন জমিতে নীল বোনা না বোনা রায়ত বা চাষীর নিজস্ব ব্যাপার। জোর করে তাঁকে নীল চাষ করানো যাবে না। তখন মোল্লাহাটির সদর কুঠির নীলকর **লারমুর** সাহেব অ্যাশলি ইডেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে নদীয়ার কমিশনার আর্থার গ্রান্ট লারমুরের পক্ষ সমর্থন করেন। এই পরিস্থিতিতে বাংলার ছোটলাট অ্যাশলি ইডেনকে সমর্থন করে নীলচাষীদের উপর সমস্ত দমন-পীড়নের কথা বললে নীলচাষীরা একজোট হতে উৎসাহিত হয়।

কিছু ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতা

দীনবন্ধু মিত্র

● **ষষ্ঠত:** এছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নীলচাষীদের বিদ্রোহে প্রেরণার সঞ্চার ঘটিয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী **"হিন্দু পেট্রিয়ট"** পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও সরকারী ঔদাসীন্যের যে জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে কৃষকরা প্রেরণা পেয়েছিল। **'অমৃতবাজার পত্রিকা'র** সম্পাদক **শিশিরকুমার ঘোষ** "M.L.L." ছদ্মনামে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাতে বহু চিঠিপত্র লিখে কৃষকদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর অকাল প্রয়াণ সম্পর্কে জনৈক কবির কণ্ঠে শোনা যায়—"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করল এবার ছারখার/অসময়ে হরিশ মল, লঙের হল কারাগার।" **নীলবিদ্রোহের পটভূমি তৈরীর ক্ষেত্রে** ঈশ্বর গুপ্তের **"সংবাদ প্রভাকর"** ও অক্ষয়কুমার দত্তের **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার** ভূমিকা ছিল। **ডঃ প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্তের 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ'** গ্রন্থে উল্লেখ

পত্র-পত্রিকার ভূমিকা

আছে নীল বিদ্রোহে কৃষকদের প্রেরণাদানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এছাড়া **দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ"** নাটক (১৮৬০) মধুসূদন দত্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করে পাদরী **জেমস লঙের** নামে প্রকাশ করলে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়।

● **সপ্তমত:** ইংরাজ ধর্মযাজক রেভারেন্ড জেমস্ লঙের মতে, নীল বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি হল—(১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, (২) শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি, (৩) ওয়াহাবী ও সিপাহী বিদ্রোহের মত উত্তেজনাময় রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এবং (৪) নীল চাষীদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের সমর্থন ও সহানুভূতি।

পাদ্রী জেমস লঙের ভূমিকা

● **নীলবিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ :**

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে **কৃষ্ণনগরের চৌগাছা** গ্রামের **বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস** ও **দিগম্বর বিশ্বাস** প্রথম নীলবিদ্রোহের সূচনা করেন। তারপর ক্রমশঃ নদীয়া, যশোর, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর, রাজশাহী, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বারাসত প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এই গণআন্দোলনে অন্য যাঁদের সক্রিয় নেতৃত্ব ছিল তার মধ্যে বাঁশবেড়িয়ার **বৈদ্যনাথ সর্দার** ও **বিশ্বনাথ সর্দার** (বিশে ডাকাত নামে খ্যাত), মালদহের **রফিক মণ্ডল**, সুন্দরবনের **রহিমউল্লা**, আসান নগরের **মেঘাই সর্দার**, মল্লিকপুরের **পাঁচু শেখ**, চণ্ডীপুরের **শ্রীহরি রায়**, রাণাঘাটের জমিদার **শ্রীগোপাল পালচৌধুরী**, সাধুহাটির **মন্মথনাথ আচার্য**, নড়াইলের জমিদার **রামরতন মল্লিক** (বাংলার নানাসাহেব নামে খ্যাত) পাবনার **মহেশ ব্যানার্জী**, ঔরঙ্গবাদের **লালচাঁদ সাহা** ও **মোরাদ বিশ্বাস** প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এইভাবে নীলবিদ্রোহ গণআন্দোলনের রূপ লাভ করলে নীলকর সাহেবরা ভাড়াটে গুণ্ডা ও লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে **'দশম আইন'** অনুসারে নীলচাষীদের উচ্ছেদ বেআইনী ঘোষিত হলে সাহেবরা বেকায়দায় পড়ে। শেষপর্যন্ত নীলচাষীদের আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল।

জমিদার ও কৃষকদের ভূমিকা

● **গুরুত্ব :** ফলাফলের বিচারে নীলবিদ্রোহ প্রথম একটি সফল কৃষকবিদ্রোহ সন্দেহ নেই। কারণ, আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলার ছোটলাট **জে. পি. গ্রান্ট "নীল কমিশন"** (Indigo Commission) নিয়োগ করেছিলেন। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হল—নীল চাষ নীতিগতভাবে দূষণীয়, ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত। নীল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নীলের দাম বাড়ে। নীল চাষের ক্ষেত্রে **তিন-কাঠিয়া প্রথা'** বা বিঘাপ্রতি তিন কাঠা জমিতে নীলচাষ করা যাবে বলা হল। তাও কৃষকের ইচ্ছাধীন। কোনপ্রকার জোরজবরদস্তি নয়। সৌভাগ্যের কথা যে, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী কৃত্রিম উপায়ে নীলের উৎপাদন শুরু করলে, ভারতে নীল চাষের গুরুত্ব কমে যায় এবং কৃষিজ নীলের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

নীলকমিশন গঠন

সিপাহী বিদ্রোহের দু'বছর পর নীলবিদ্রোহ শুরু হয় এবং ইহা দু'বছর ধরে চলতে থাকে। ফলাফল ও গুরুত্বের বিচারে নীলবিদ্রোহ নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

● **প্রথমত:** নীলবিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক উৎপীড়ন ও বে-আইনী স্বেচ্ছাচারিতা থেকে দরিদ্র কৃষকরা দৃঢ় মনোবল হয়ে যেভাবে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা এক বিরল নজীর। **বাংলার ৬০ লক্ষ কৃষক কোন প্রকার সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।** কিন্তু **অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিতের** মতে, এই বিদ্রোহে কৃষকের তেমন ভূমিকা ছিল না। জমিদারশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে এই বিদ্রোহে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিক **ব্লেয়ার ক্লিং** এই মতের বিরোধীতা করে বলেন, **"এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব যে রায়ত থেকে জমিদার পর্যন্ত সকল স্তরে ব্যাপ্ত ছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাদি রয়েছে।"**

ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন

● **দ্বিতীয়ত:** নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় **বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ যেভাবে এগিয়ে এসে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিল তা এক বিরল ঘটনা।** কারণ এর আগে সিপাহী বিদ্রোহের মত অত বড় বিদ্রোহে মধ্যবিত্তদের ভূমিকা ছিল না।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভূমিকা

● **তৃতীয়ত: ইংরাজ পাদ্রী ও ইংরাজ কর্মচারীদের একাংশ নিপীড়িত কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে যেভাবে এসেছিলেন,** তাতে জনগণের মধ্যে হিতাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে।

ইংরাজদের মনোভাব

● **চতুর্থত: নীলবিদ্রোহ থেকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।** মৃতপ্রায় বাঙালীজাতি নতুন এক আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল। সুতরাং বাঙালী জাগরণে এই বিদ্রোহের অসামান্য অবদান ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মে **'অমৃতবাজার পত্রিকা'র** সম্পাদক **শিশিরকুমার ঘোষ** লিখেছিলেন **"নীলবিদ্রোহই সর্বপ্রথম ভারতবাসীকে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল। বস্তুতঃ ইংরাজ শাসন কায়েম হওয়ার পর এটাই ছিল বাংলার প্রথম বিপ্লব।"**

শক্তিশালি রাজনৈতিক আন্দোলনের দিশারী

পরিশেষে বলা যায় নীলবিদ্রোহে কৃষকদের জয় হলেও **ডঃ চিত্তব্রত পালিতের** মতে কৃষিব্যবস্থার মূল জটিলতা ও সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। তবে **হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী** তাঁর **'হিন্দু পেট্রিয়টে'** নীলবিদ্রোহের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন, **"শক্তি নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক জ্ঞান নেই, এমনকি নেতৃত্ব নেই তবুও বাংলার কৃষকরা এমন একটি বিপ্লব সংগঠিত করেছে যাকে অন্যদেশের বিপ্লবের থেকে কি ব্যাপকতায়, কি গুরুত্বে কোনদিক থেকেই নিকৃষ্ট বলা চলে না।"**

উপসংহার

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য*

সামগ্রিক পর্যালোচনা থেকে আমরা এই সংবিধানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই. ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বা গঠনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার সময় থেকেই সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

(১) **বিশালতা ও জটিলতা :** ভারতের সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত ও জটিল সংবিধান। বর্তমানে এই সংবিধান **৩৯৫টি ধারা, ১২টি তপসিল** বা তালিকা (Schedule) ও **অসংখ্য উপধারা** ও **অলিখিত বিষয়** নিয়ে গঠিত হয়েছে। তার উপর বারে বারে **সংবিধান সংশোধনের** (৮৫ বার) ফলে সংবিধানের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা, বহু অলিখিত ধারা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করতে গিয়ে সংবিধান জটিল আকার নিয়েছে।

(২) **সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইস** ভারতীয় সংবিধানের লিখিত ও অলিখিত ধারার একই সঙ্গে সমন্বয় লক্ষ্য করে এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রচলিত রীতি-নীতির ভিত্তিতে অলিখিত ধারাগুলি গড়ে উঠেছে, যা সহজেই পরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ সুপরিবর্তনীয়। আবার প্রচুর লিখিত ধারা আছে, যা সহজেই পরিবর্তন করা যায় না। ইহাকে দুষ্পরিবর্তনীয়তা বলা হয়। কারণ এক্ষেত্রে কোন ধারা পরিবর্তন করতে হলে আইনসভার উচ্চ কক্ষ ও নিম্নকক্ষের, ২/৩ অংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং ৩/৪ অংশ সদস্যের দ্বারা তা গৃহীত না হলে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না।

(৩) **যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক শাসনের সমন্বয় :** ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন কাঠামোর ন্যায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীকরণ নীতির মাধ্যমে কতকগুলি রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মূলরাজ্য হিসাবে গড়েছে। কানাডার সংবিধানের অনুকরণে ভারত যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রিকরণের দ্বারা কতকগুলি রাজ্য সরকারে বিভক্ত হয়েছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো অনুসারে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যে রাজ্য সরকার গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের জন্য সংবিধানে তিনটি তালিকা আছে—**কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্মতালিকা**। তবে যুগ্মতালিকার বেশির ভাগ ক্ষমতা কেন্দ্র ভোগ করে। তাছাড়া সাংবিধানিক প্রধান রাষ্ট্রপতি জরুরী ক্ষমতা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন। কেন্দ্রের উপর রাজ্যের নির্ভরশীলতাও সর্বজনবিদিত। এই কারণে **অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার** ভারতের সংবিধানকে **আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়** (Quasi federal) বলেছেন।

(৪) **মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি :** ভারতীয় সংবিধানের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল **মৌলিক অধিকারের** (Fundamental rights) স্বীকৃতি। সংবিধানের ১৪নং থেকে ৩৫নং ধারাতে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত সাতটি মৌলিক অধিকার হল-(১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার, (৫) ধর্মের অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার ও (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। তবে **১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে** ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা **'সম্পত্তির অধিকার'** কে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে ভারতের নাগরিকরা ছয়টি মৌলিক অধিকার ভোগ করছেন। তবে এই অধিকারগুলি মৌলিক হলেও অবাধ নয়, শর্তসাপেক্ষ।

(৫) **রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি :** আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের অনুকরণে গৃহীত **'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি** সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য (Directive Principles)। ভারতের সংবিধানে ৩৬নং থেকে ৫১নং ধারাগুলিতে এই নির্দেশমূলক নীতি গৃহীত

হওয়ার মূল কারণ হল ভারতকে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র (Welfare state) পরিণত করা। বেকারভাতা, বার্ধক্যভাতা, স্ত্রী ও শিশুদের বিশেষ সুযোগ দান, অবৈতনিক চিকিৎসা ইত্যাদি এই নীতির অন্তর্গত। মৌলিক অধিকারের মত এগুলি আইনে বলবৎযোগ্য না হলেও ৪২তম সংবিধান সংশোধনে এই নীতিগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

(৬) **পার্লামেন্টীয় শাসন কাঠামো** : ব্রিটেনের সংবিধানের অনুকরণে ভারতের সংবিধানে পার্লামেন্টীয় বা সংসদীয় বা মন্ত্রী-পরিষদীয় শাসন নীতি প্রবর্তিত হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও ভারতের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক বা নামসর্বস্ব প্রধান শাসক। সংবিধান অনুসারে ভারতে **লোকসভার (নিম্নকক্ষের)** সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি মন্ত্রী-পরিষদই চরম ক্ষমতার অধিকারী (There shall be a Council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advice the president exercise his functions — Article No-78) রাজ্যগুলিতেও এই প্রথা চালু আছে।

(৭) **এক-নাগরিকত্ব** : আমেরিকার নাগরিকদের মত ভারতের নাগরিকরা **দ্বৈত নাগরিকত্ব** (Dual Citizenship) ভোগ করেন না। ভারতের সংবিধান অনুসারে এদেশের নাগরিকরা শুধু ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক, কোন অঙ্গরাজ্যের পৃথক নাগরিকত্ব তাদের নেই।

(৮) **মৌলিক কর্তব্য** : ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ১০টি **মৌলিক কর্তব্যের** (Fundamental duties) উল্লেখ আছে। প্রতিটি নাগরিক এই কর্তব্যগুলি মেনে চলতে বাধ্য। এই কর্তব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সংবিধানের আদর্শ মান্য করা, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, সংহতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি মর্যাদা প্রদান।

(৯) **ধর্মনিরপেক্ষতা** : ভারতের সংবিধানের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষিত হয়। সহজ কথায়, প্রতিবেশী বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মত ধর্মাশ্রিত দেশ (theocratic) ভারত নয়।

এছাড়া প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার, অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ, আইন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়, প্রস্তাবনা, সুপ্রিম কোর্টের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বহু বৈশিষ্ট্য ভারতের সংবিধানকে বৈচিত্র্য মণ্ডিত করেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি চিনিয়ে দেয় ভারত ও ভারতের সংবিধানকে।

❖ **টীকা লেখ** :

মহাবিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল

● **রাজনৈতিক কারণ** : ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত এই ১০০ বছর ধরে বৃটিশরা রাজ্যগ্রাস নীতির মাধ্যমে যে নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল তা সর্বস্তরের মানুষকে বৃটিশ বিদ্বেষী করে তুলেছিল। **ক্লাইভ সু-শাসনের নামে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠা করে** বাংলায় দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিলেন। **ওয়েলেসলী অধীনতামূলক নীতির** মাধ্যমে যে রাজ্যগ্রাস নীতি নেন তাও রাজনৈতিক অশান্তি বাড়িয়েছিল। **লর্ড ডালহৌসী স্বত্ব বিলোপ** নীতি প্রয়োগ করে ভারতীয়দের দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য দখল করলে জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরাজ সরকারের দেশীয় রাজ্যের প্রতি নৃশংস অত্যাচার দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তাই **ডঃ আর. সি. মজুমদার**-এর মতে—"Who could be safe, it the British thus treated one who had ever been their most faithfully."

রাণী লক্ষ্মীবাই

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

শুধু রাজন্যবর্গের কথা নয়, **সাঁওতাল, ভীল, খাসি, জাঠ ও ফরাজীগণ** ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৮০৬ সাল থেকে ভূপালের ভারতীয় সিপাহীরা দারুণ অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ তাদের কপালে তিলক পরা বা মাথায় পাগড়ী বাঁধার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের খেতাব বর্জন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সার্বভৌম ক্ষমতা জাহির করলে মুসলমান সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়।

● **অর্থনৈতিক কারণ** : অধ্যাপক **পি. জে. মার্শাল** তাঁর "East India Fortune" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে পলকাটা হীরের মাধ্যমে, দিনেমার বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে, 'Bill of Exchange' বা 'হুণ্ডির' মাধ্যমে এ দেশের প্রচুর সম্পদ এবং সোনা-রূপা ও মূল্যবান জিনিসপত্র বিলাতে নিয়ে গেলে এদেশের দারিদ্র্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। দেওয়ানী লাভের পর থেকে ভূমিরাজস্বের হারও মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। **চ্যার্টার অ্যাক্ট** পাশ (১৮৩৩) হলে ইওরোপের অন্যান্য বাণিজ্য সংস্থা এদেশে বাণিজ্যের সুযোগ পায়। এই ভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে চাপ বাড়তে থাকে।

স্বল্প মূল্যে এদেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে অধিক মূল্যের শিল্পজাত পণ্য বৃটিশরা বিক্রি করে। ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রে ভারতের বাজার ভরে যায় যা ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল। তাছাড়া চড়া হারে **শুল্ক ধার্য** ও **সম্পদের নির্গমন তত্ত্ব** ("Dranage of wealth") ভারতে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে এদেশের কর্মচারীদের বেতন ইওরোপের

কর্মচারীদের থেকে খুবই কম ছিল। **এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ আছে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ২৫০ জন ভারতীয় কর্মীর জন্য বছরে যেখানে ব্যয় হতো ৯৮ লক্ষ পাউণ্ড সেখানে ৫১৩১৬ জন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হত ২৩৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড।** মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল এই অর্থনৈতিক বৈষম্য।

● **সামাজিক কারণ** : "**সিয়ার-উল-মুতাখেরিন**"-গ্রন্থ থেকে জানা গেছে, সামাজিক বৈষম্য মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে জঘন্য রূপ নেয়। ইংরাজরা এদেশের মানুষদের "**কালা আদমী**" বলে ঘৃণা করত। লর্ড কর্ণওয়ালিস একসময় বলেছিলেন—"**হিন্দুস্থানের প্রতিটি মানুষ অধঃপতিত ও হীনজাতি**"। **ডঃ নিখিল বসু** একস্থানে লিখেছেন বেন্টিঙ্ক স্বয়ং ভারতীয়দের সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। **মেকলে** পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনকালে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে যত গ্রন্থ আছে তা গুণগত দিক থেকে ইউরোপের একটি লাইব্রেরির বই-এর সঙ্গে তুলনীয় নয়।

লেফটেন্যান্ট ডার্নের রচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় ভারতীয়দের সাথে ইংরাজ কর্মচারীদের মিশতে সংকোচ লাগত। বৃটিশদের জন্য নির্ধারিত রেস্তোরাঁ, পার্ক, হোটেল, ক্লাব প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বহু ইওরোপীয় নাইট ক্লাবের প্রবেশ পথে লেখা থাকতো—"**কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ**"। আগ্রার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট এক আইনে বলেছিলেন—'**রাস্তায় কোন ইংরাজকে দেখতে পেলেই ভারতীয়দের সেলাম জানাতে হবে।**' অফিস আদালতেও ভারতীয় অফিসার ও সাধারণ মানুষজন জাতিগত কারণে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন।

● **সামরিক কারণ** : ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের আর একটি কারণ ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ। ভারতীয় সিপাহীদের অসন্তোষের অন্যতম কারণগুলো হল—(ক) **ইউরোপীয় সেনাদের চেয়ে বেতন কম**, (খ) **খাওয়াদাওয়া নিম্ন মানের**, (গ) **ইংরাজ ব্যাটেলিয়ানদের দুর্ব্যবহার**, (ঘ) **পদোন্নতির অভাব**, (ঙ) **দূরদেশের সমুদ্রপারে বিপজ্জনক স্থানে ভারতীয় সিপাহীদের পাঠান ইত্যাদি ছিল সিপাহীদের অসন্তোষের প্রধান কারণ**। R. C. Majumdar. (তাঁর "British Paramountcy and Indian Renaissance" গ্রন্থে) বলেছেন, **ভারতীয় সিপাহীদের বেতন ছিল মাসে ৯ টাকা**। হিন্দু সিপাহীদের কালাপানি স্পর্শের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিতে হতো যা অসন্তোষের প্রধান কারণ। ধর্মনাশের ইহা অন্যতম কারণ। টমাস মনরোর মতে, ইংরাজদের ব্যবহারে ভারতীয় সিপাহীরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিল। বিপানচন্দ্রের মতে, **ভারতীয় সামরিক ছাউনিগুলিতে এদেশের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশী আর ইউরোপীয়** সৈন্য **ছিল** ৪৫,০০০। **সুতরাং সংখ্যার দিক থেকে এদেশের সিপাহীদের অসন্তোষ যে আসন্ন বিদ্রোহের ইঙ্গিতবাহী তাতে কোন সন্দেহ নেই**। এই অসন্তোষ থেকেই **১৮৫৭-র ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করে শহীদ হয়েছিলেন।**

● **ধর্মীয় কারণ** : **ডঃ এসো ব্রিগস্** (তাঁর "The Age of Improvement" গ্রন্থে) বলেছেন, ইংরেজ পাদরী ও যাজকরা এদেশের উন্নতির নামে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে আসেন। এক সময় ইহা ভারতীয়দের অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের অন্তরালে ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চলেছিল। জেলখানায় ভারতীয় কয়েদিদের কাছে যাজকরা গিয়ে মুক্তির লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণের চেষ্টা করাত। দারিদ্র্যের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ও ভারতীয়দের নানা সুবিধা দেবার অজুহাতে অনেককে খ্রীষ্টান করা হয়। পরবর্তী কালে এই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যের জন্য মানুষ সিপাহী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।

● **প্রত্যক্ষ কারণ** : '**এনফিল্ড রাইফেল**' নামে এক নতুন বন্দুক সিপাহীদের হাতে দেওয়া

■ **মহাবিদ্রোহের ফলাফল :**

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ঐতিহাসিক স্যার লেপেল গ্রিফিন-এর মতে "The revolt of 1857 swept the Indian sky clear of many clouds" অর্থাৎ ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ভারতের আকাশ থেকে বহু কালো মেঘ সরিয়ে দিয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল।

● **প্রথমতঃ** ১৮৫৭-র ২রা আগষ্ট "An act for the better Government in India"—পাশ হয়। এই আইন বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসনভার সরাসরি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে চলে যায়। গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে ভাইসরয়ের পদ সৃষ্টি হয়। Board of Control এবং Court of Director-এর অবসান ঘটিয়ে Secretary of states for India বা ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি হয়। শাসন পরিচালনার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট Imperial Legislative Council গঠিত হয়।

● **দ্বিতীয়তঃ** ১৮৫৮-এর ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দেন—

(i) স্বত্ব বিলোপ নীতির অবসান ঘটানো হবে।
(ii) যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দের চাকরিতে নিয়োগ করা হবে।
(iii) সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিত্যক্ত হবে।
(iv) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারো প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি হস্তক্ষেপ করা হবে না।
(v) গুরুতর অপরাধের সাথে জড়িত ছাড়া আর সকল ভারতীয় কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া হবে।

● **তৃতীয়তঃ** ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হয় যাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় সিপাহীরা আর বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে তাই ভারতীয় সিপাহীদের উচ্চ পদে নিয়োগ বন্ধ হয়।

● **চতুর্থতঃ** হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদ নীতি প্রচার করা হয় যাতে ভারতীয়রা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পরে।

● **পঞ্চমতঃ** ভারতীয়দের সন্তুষ্ট রাখতে ফৌজদারি আইন সংস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি পাশ করা হয়। শাসনক্ষেত্রে 'পোর্টফোলিও' বা দপ্তর বণ্টন ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ হয়। তথাপি স্বায়ত্ত্ব শাসনের দাবি তুলে ভারতীয়রা অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। বিদ্রোহ পরবর্তী যুগে অসন্তোষের আরেকটি কারণ হল মহারাণী তাঁর পূর্ব ঘোষিত কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করেননি। ডঃ বিপানচন্দ্র একে "রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি" বলেছেন। R. C. Majumdarও একই মন্তব্য করেছেন—"The period of administration by the crown was thus became a period of broken pledges."

❖ প্রশ্ন (১২) : *প্রবন্ধ লেখ : রাজা রামমোহন রায়।* [redacted]

অথবা, রাজা রামমোহন রায়কে "আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ" বলা হয় কেন? [[redacted]]

অথবা, কাকে ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে? আধুনিক বঙ্গের গঠনে তাঁর অবদান নির্ণয় কর। [[redacted]]

অথবা, রাজা রামমোহন রায়ের অবদান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। [[redacted]]

■ **উত্তর :** ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ফলে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে। ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার অবসান ঘটাতে এর প্রভাব ছিল। এইসময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যে সব মনীষী কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে সমাজের বন্ধনমুক্তির জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন, তার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় হলেন অগ্রগণ্য। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায় ও মাতা ছিলেন তারিণী দেবী। প্রথমে তিনি রংপুরের কালেক্টর **জন ডিগবীর** অধীনে 'দেওয়ান' রূপে (১৮০৯-১৮১৪ খ্রীঃ) কাজ করেছিলেন। পরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তিনি বাংলার জরাগ্রস্ত সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

● **রামমোহনের ধর্মসংস্কার :** আধুনিক ভারতের **'প্রমিথিউস'** ও **নবজাগরণের অগ্রদূত** রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী জ্ঞানালোকে দেখেছিলেন বাংলার ধর্মীয় জীবন বড়ই জটিল ও রক্ষণশীল। তাই ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে তিনি **আরবীতে কোরাণ, সংস্কৃতে উপনিষদ ও বেদ, গ্রীক ভাষাতে 'নিউ টেস্টামেন্ট', তালমুড ও ওল্ডটেস্টামেন্ট হিব্রু ভাষাতে পড়ে ফেলেছিলেন।** রামমোহন আরবী, ফার্সী, উর্দু, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, জার্মান, ইংরাজী প্রভৃতি প্রায় ১২টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাই কোরাণ, পুরাণ, বেদ, বাইবেল, উপনিষদ, সুফীদর্শন, জেন্দাবেস্তা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তিনি বুঝেছিলেন ধর্মীয় আড়ম্বর অর্থহীন। একেশ্বরবাদী মুয়াবিদ ও যুক্তিবাদী 'মতাজালিদের' প্রভাবে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি পৌত্তলিকতার প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পণ্ডিত **ব্রজেন্দ্রনাথ শীল** জানিয়েছেন—**"বাগদাদ ও বাসরার সংস্কৃতি, ঐশ্লামিক সংস্কৃতি এক ভারতীয় মাদ্রাসার মধ্য দিয়ে সিঞ্চিত হয়ে বালকের (রামমোহনের) মনকে প্রথম নাড়া দেয়।"** ১৮০৩ খ্রীঃ তিনি **"তুহফাত-উল্-মুহাইদ্দিন"** নামে ফার্সী ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করে ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই অপরাধে তাই তিনি শুধু গৃহছাড়া হননি, হিন্দু সমাজের কাছে কঠোর সমালোচিত হয়েছিলেন।

রামমোহন

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে কিছুকাল তন্ত্রশিক্ষা করার ফলে ধর্মমত ও পথ সম্পর্কে অনেকটা স্বচ্ছ ধারণা পেয়েছিলেন। ১৮১৪ খ্রীঃ কলকাতার খ্রিষ্টান মিশনারীদের নিউ টেষ্টামেন্টের নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইংরাজীতে 'The percepts of Jesus' [illegible] করেছিলেন। তাই কিশোরীচাঁদ মি[illegible] [illegible]কে '[illegible]পন্থী ধর্মনেতা' (religious

Benthamite) বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৮১৫ খ্রীঃ রামমোহন তাঁর অনুগামী যুবক সম্প্রদায়কে নিয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক কু-সংস্কার বিরোধী আন্দোলন জনপ্রিয় করে তুলতে "**আত্মীয়সভা**" গঠন করেছিলেন। এইসময় পৌত্তলিকতাবিরোধী তর্কযুদ্ধে রামমোহন যেসব গোঁড়াপন্থী হিন্দু পণ্ডিতদের হারিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে **উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী, রাধাকান্ত দেব** উল্লেখযোগ্য। একসময় **রেভারেন্ড ডয়েসার স্কিমিডট** রামমোহনকে "**সত্যের ক্ষতিকারক**" বলে সমালোচনা করলে তিনি তাঁর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন "**ব্রাহ্মনিক্যাল রিঅ্যাকশনারী ম্যাগাজিন**" পত্রিকাতে। ১৮১৬ খ্রীঃ তিনি '**বেদান্তসার**' এবং '**কঠ**', '**কেন**', '**ঈশ**', '**মণ্ডুক**', ও '**মাণ্ডুক্য**' এই পাঁচটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

১৮২১ খ্রীঃ রামমোহন তাঁর 'একেশ্বরবাদ' ও সর্বধর্ম সমন্বয়বাদকে জনপ্রিয় করতে "**ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান কমিটি**" বন্ধু উইলিয়াম অ্যাডামের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮২৫ খ্রীঃ হিন্দু একেশ্বরবাদ প্রচার করতে '**বেদান্ত কলেজ**' গঠন করেছিলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ তিনি '**ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোশিয়েশন**' এবং ১৮২৮ খ্রীঃ '**ব্রাহ্ম সমাজ**' গঠন করেন। ইহা '**ব্রহ্ম সভা**' নামে পরিচিত। এখানে ব্রাহ্ম বা একেশ্বরকে উপাসনার জন্য প্রতি শনিবারের পরিবর্তে বুধবার সন্ধ্যায় বিশেষ সমাবেশ ডাকা হত। রামমোহন হাফেজের সুরে বলতেন, "**কারো অনিষ্টের চেষ্টা করো না, আর যা খুশি কর**"। **প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়** বলেন রামমোহনের ধর্মচিন্তা ছিল "**সর্ব মানবের ধর্ম এক বিশ্ব ধর্ম**" ("Universal Religion)। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** রামমোহনের সত্যোপলব্ধিকে বলেছেন **মানুষের ধর্ম** (Religion of Man)—**তা হিন্দুর ধর্ম নয়, মুসলমানের ধর্ম নয়, খ্রীষ্টানের ধর্ম নয়—তা শাশ্বত মানবের ধর্ম।**"

● **রামমোহনের সমাজসংস্কার :** এক দরদী বাস্তববাদী সংস্কারক রূপে রাজা রামমোহন রায় জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, বর্ণপ্রথা, পুরোহিত প্রাধান্য, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথা ইত্যাদির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে এক সুস্থ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

রামমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮২৯ খ্রীঃ বেন্টিং "**রেগুলেশন—XVII**" **আইন** দ্বারা সতীদাহ নিবারণ আইন সিদ্ধ করেন। এইসময় '**সমাচার দর্পণ**,' '**সংবাদ কৌমুদী**', '**বেঙ্গল হরকারু**', '**ইন্ডিয়ান গেজেট**', '**ক্যালকাটা জার্নাল**', '**ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া**' ইত্যাদি পত্রিকাতে সতীদাহের বিরোধিতাও করা হয়েছিল। পিতৃসম্পত্তিতে কন্যাদের পূর্ণ আইনগত অধিকার স্থাপনের জন্য ১৮২২ খ্রীঃ তিনি যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস স্মৃতির যুক্তি তুলে ধরে বলেছিলেন শাস্ত্রে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার আছে। শেষপর্যন্ত তাঁরই চাপে সরকার সম্পত্তিতে নারীদের আইনগত অধিকারের স্বীকৃতি দেন। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পুরুষদের দ্বিতীয় বিবাহ বা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি জনমত গড়ে তোলেন। তিনি **মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের** "**বজ্রসূচী**" গ্রন্থের কিছু অংশ সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে জাতপাতের সব ধ্যানধারণা মুছে দিয়ে প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহকেও সমর্থন করেছিলেন। এমন মরমী, মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বড় কম দেখা যায়।

● **রামমোহনের শিক্ষাসংস্কার :** পাশ্চাত্যবাদী রামমোহন বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে '**হিন্দু কলেজ**' (প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৫৫) প্রতিষ্ঠার পিছনে রামমোহনের ভূমিকা ছিল। কিন্তু **ডঃ আর. সি. মজুমদার** মনে করেন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে রামমোহনের কোন অবদান ছিল না।

রামমোহন রায় মনে করতেন তাত্ত্বিক বা কোন পুঁথিগত জ্ঞান দিয়ে জাতির সামগ্রিক উন্নতি হয় না। তাই তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন, আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির উপর বিশেষ জোর

দিয়েছিলেন। ১৮২৯ খ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর **কলিকাতার টাউন হলে** এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, **ভারতীয়দের মানসিক উৎকর্ষের জন্য ইউরোপীয়দের সান্নিধ্য খুব বেশি করে দরকার**। এর আগে ১৮২৩ খ্রীঃ রামমোহন লর্ড আর্মহার্স্টকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের দেশের উন্নতি হবে না। অবিলম্বে তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটান দরকার।' রামমোহনের চেষ্টাতেই শেষপর্যন্ত বেন্টিঙ্কের শিক্ষাসচিব **মেকলে** তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের সরকারী সুপারিশ করেছিলেন। ১৮৩০ খ্রীঃ আলেকজান্ডার ডাফ কর্তৃক "**জেনারেল এসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন**" (স্কটিশচার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্য ছিল।

● **রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তা :** রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে উদ্ভূত ভূমিরাজস্ব সমস্যার বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনও করেছিলেন। তিনি ভারতে কৃষিব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য জমিদারী অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। '**১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার অ্যাক্ট**'-এর দ্বারা সংশোধন করে কৃষির আধুনিকীকরণের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁর মতামতের গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামমোহনের ইচ্ছানুযায়ী এই আইনবলে বিদেশী পুঁজি, প্রযুক্তি ও উদ্যোগের আগমনের ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকেনি। তিনি ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি ও ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদের নির্গমনের বিরোধিতা করেছিলেন '**সিলেক্ট কমিটির**' কাছে। ভারতের চিরায়ত দারিদ্র, দুঃখ, বাণিজ্য ও ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের বিরুদ্ধে তিনি কোন জোরালো বক্তব্য পেশ করেননি।

● **রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তা :** রামমোহন ছিলেন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক। মিল, বেন্থাম, রুশো, ভলতেয়ার, মন্তেস্কুর প্রভাবে তিনি ফরাসী বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রনেতাদের কাছে মানবতাবাদী শাসন আশা করেছিলেন। **অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাসের** মতে, "**মিল-বেন্থাম ব্যাখ্যাত উপযোগবাদ অপেক্ষা রামমোহনের মানবিকতাবাদ ছিল উদার, প্রাণবন্ত ও চলিষ্ণু।**" ১৮২৩ খ্রীঃ **সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন** ও ১৮২৭ খ্রীঃ '**জুরী আইনে**'র বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন।

● **মূল্যায়ন :** রামমোহনের জীবনীকার **শ্রীমতি সোফিয়া ডবসন কোলেট** রামমোহনকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অনেকে রামমোহনের মধ্যে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছেন। গান্ধীজী তাঁকে '**পিগমি**' বলেছেন। রামমোহন কুটির শিল্পের ধ্বংসের বিরুদ্ধে এবং নারীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগী হননি বলে কেউ কেউ মনে করেন। **সালাদিন আহমেদ** বলেছেন **ধর্ম বিপ্লব আনতে মার্টিন লুথার যে ধরনের ভূমিকা নিয়েছিলেন তা রামমোহন** নেন নি। **অধ্যাপক সুমিত সরকার** বলেন, তিনি রক্ষণশীলতা কিছুটা ভাঙতে পারলেও, কোন মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের কথা ভাবেননি। তাঁর চিন্তাধারা শুধুমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঘরে-বাইরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর কৃতিত্ব নিতান্ত কম নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে '**ভারত পথিক**', বিপিনচন্দ্র পাল '**নবযুগের প্রবর্তক**', ডঃ দিলীপ বিশ্বাস '**বিশ্বমানব**', ব্রজেন্দ্রনাথ শীল '**আন্তর্জাতিক মানুষ**' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সত্যিই তিনি ছিলেন "ভারতের প্রমিথিউস", "**ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ**"।

❖ প্রশ্ন (১৩) : ***ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।***

[[redacted]]

■ **উত্তর :** ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব সংস্কারকরা সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। বাংলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিলেন তিনি। তাই বিদ্যাসাগরকে একজন বাস্তববাদী মানবতাবাদী

সমাজসংস্কারক বলা হয়। তাঁর পূর্ববর্তী রামমোহন ও ডিরোজিও প্রমুখ সংস্কারকদের মধ্যে না... সামাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা কিছু সমালোচক খুঁজে পেলেও বিদ্যাসাগরের মধ্যে তেমনটি পাওয়া যায়নি। তাই **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** লিখেছেন "এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মানুষের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ...তাঁহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নেই।"

বিদ্যাসাগর

● **শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের অবদান :** বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সহিত্যে সুপণ্ডিত হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ড্রিংক ওয়াটার বেথুনের সহযোগিতায় **"হিন্দু ফিমেল স্কুল"** প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি **'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র** সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতে **"স্ত্রীশিক্ষা সম্মিলনী"** গঠন করেছিলেন। তাঁর সারাজীবনে তিনি মোট ৩৫টি **বালিকা বিদ্যালয়** তৈরী করেছিলেন, রাধাকান্ত দেবের মত গোঁড়া হিন্দু এক্ষেত্রে উৎসাহী ছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির সবই গ্রামে অবস্থিত ছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ১৩০০ ছাত্রী ছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ক্যাম্পবেল মফঃস্বলের কিছু কলেজ তুলে দিয়ে শিক্ষার প্রসার হ্রাস করতে উদ্যোগী হলে শিক্ষিত বাঙালীদের অনেকে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিজের খরচে কলকাতায় **'মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন'** (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ) তৈরী করে ক্যাম্পবেল সাহেবের ব্যবস্থার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর জোর দিলেও তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বদাই গুরুত্ব দিতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের কাছে এই কলেজের দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন। শিক্ষার সুষম বিকাশের জন্য তিনি **'বাংলা মডেল স্কুল'** তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে প্রধান হল **'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'সীতার বনবাস', 'বাংলার ইতিহাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা'। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক মন্তব্য** এবং তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী **'প্রভাবতী সম্ভাষণ'**। তিনি বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তক ছিলেন। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** তাঁকে **"বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী"** বলে উল্লেখ করেছেন।

● **সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা :** ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ আইন' পাশের পিছনে বিদ্যাসাগরের নিরলস প্রচেষ্টা ছিল। তিনিই প্রথম ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর ১০০০ বিশিষ্ট মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত এক স্মারকলিপি সরকারের কাছে জমা দিয়ে বিধবাদের পুনর্বার বিবাহের জন্য আইন পাশের দাবী তুলেছিলেন। তিনি **পরাশর সংহিতার** তথ্য তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। এবিষয়ে তিনি **"বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব"** (১৮৫৫) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। **'তত্ত্ববোধিনী**

পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের হয়ে বিধবা বিবাহের পক্ষে মত প্রচার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর ২৪ পরগণার শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমানের পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখার্জীর দশ বছর বয়সী বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর বিবাহ দেন। তারপর নিজ পুত্র নারায়ণকে ভবসুন্দরী নামে এক অষ্টাদশী বিধবার সঙ্গে বিবাহ দেন। এইভাবে তিনি বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন।

এছাড়া বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথা, কুষ্ঠরোগী হত্যা ইত্যাদি কু-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতারও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় নানা প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিদ্যাসাগর তাঁর উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল করতে পেরেছিলেন।

● তবে সংস্কারক হিসাবে তিনি সম্পূর্ণতা অর্জন করলেও বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন। তাই ইংরাজদের উদারনীতির উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। **ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী** এই কারণে তাঁকে **'গতানুগতিক আধুনিক সংস্কারক'** ("traditional modernizer") বলে চিহ্নিত করেছিলেন। **অধ্যাপক অশোক সেন** (তাঁর Vidyasagar and his illusive milestones গ্রন্থে) বলেছেন ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় বিদ্যাসাগরের সমস্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল সংস্কার প্রচেষ্টা মায়ামরীচিকার মত ছিল। কিন্তু সমালোচনা যতই করার চেষ্টা হোক না কেন বিদ্যাসাগর বাংলার ও বাঙালীর একান্ত ঘরের মানুষ, আপনজন। তাঁর মানবতাবাদ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বহুমুখী প্রতিভা, বাস্তববুদ্ধি ইত্যাদির জন্য **মাইকেল মধুসূদন দত্ত** মন্তব্য করেছেন "বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রাচীন মুনিঋষিদের মত বহুমুখী প্রতিভা ও প্রজ্ঞা, ইংরাজদের মত কর্মদক্ষতা এবং বাঙালী মায়ের মত কোমল হৃদয়বত্তার সমাবেশ ঘটেছিল।"[১০] পণ্ডিত **বিনয় ঘোষও** তাঁর **'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'** গ্রন্থে বলেছেন, বিদ্যাসাগরের মধ্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সমন্বয় ঘটেছিল। এটাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ আর্থিক নিষ্ক্রমণ (Economic Drain) ঃ

পলাশির যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে সমগ্র অষ্টাদশ শতক ধরে বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ জলস্রোতের মতো ইংল্যাণ্ডে চলে যায় এবং এর বিনিময়ে ভারত কোনও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায় নি। ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতরা এই ঘটনাকে *'আর্থিক নিষ্ক্রমণ'*, *'আর্থিক নির্গমন'*, *'সম্পদের বহির্গমন'* বা *'Economic Drain'* বলে অভিহিত করেছেন। ব্রুকস্ অ্যাডামস্ (Brooks Adams) নামে জনৈক গবেষক এই ঘটনাকে *'পলাশি লুণ্ঠন'* বা *'Plassey plunder'* বলে অভিহিত করেছেন। এরপর থেকে 'পলাশি লুণ্ঠন' কথাটি চালু হয়ে গেছে। অর্থনীতিবিদ ***অধ্যাপক অম্লান দত্ত*** *Economic Drain* কথাটির বাংলা করেছেন *'অপহার'*। সমকালীন ইংরেজ শাসকদের মধ্যে ভেরেলেস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন শোর, জেমস গ্রান্ট এবং বিশিষ্ট ইংরেজ রাজনীতিবিদ এডমণ্ড বার্ক-ও পলাশি লুণ্ঠন বা আর্থিক নিষ্ক্রমণের কথা স্বীকার করেছেন।

অর্থ

এই আর্থিক নির্গমন হয়েছিল মোটামুটি দু'টি ধারায়। (১) বেসরকারিভাবে কোম্পানির কর্মচারী, ইংরেজ বণিক প্রভৃতির দ্বারা বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন এবং তা ইংল্যাণ্ডে পাঠানোর ফলে সম্পদের নির্গমন, এবং (২) কোম্পানির বাণিজ্য, আর্থিক ও রাজস্বনীতির ফলে বাংলার সম্পদের নির্গমন।

পলাশি লুণ্ঠনের দু'টি ধারা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধজয়ের পর থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভ পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীরা উৎকোচ, উপঢৌকন, নজরানা ও অন্যান্য সূত্রে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ঐ অর্থ দেশে পাঠায়। এই অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ক্লাইভ ছিলেন এই লুণ্ঠনের পথপ্রদর্শক। টাকার নেশায় উন্মত্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন—"টাকা, শুধু টাকা! নষ্ট করার মতো সময় একদম নেই" ("Money! Money! and no time to be lost.")।[১] পলাশির যুদ্ধের পর মিরজাফর সিংহাসনে বসে কোম্পানির কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য হন—এর পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা। ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে একাই পান প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৩০ হাজার পাউন্ড আয়ের একটি জায়গির। মিরকাশিমকে সিংহাসনে বসিয়ে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও কলকাতা কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা পান ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নজমউদ্দৌলা-

(১) কর্মচারীদের উৎকোচ ও উপঢৌকন

---

[১] Quoted in *Economic History of Bengal, Vol I,* N.K. Sinha, 1956, P.210.

কে সিংহাসনে বসিয়ে কোম্পানির কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা লাভ করেন। রেজা খাঁ *'নায়েব নাজিম'* পদ লাভের জন্য কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দেন। এক কথায়, বাংলায় তখন ঢালাও লুণ্ঠন চলতে থাকে। ঐতিহাসিক ***পার্সিভ্যাল স্পিয়ার*** (P. Spear) পলাশি-পরবর্তী এই যুগকে *"প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ"* ('Age of open and unashamed plunder') বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক ***টমসন ও গ্যারাট*** (Thompson and Garratt) বাংলাকে একটি 'টাকার গাছ' ('Pagoda tree') বলে অভিহিত করেছেন, যা নাড়া দিয়ে টাকা কুড়োনো যায়। বলা বাহুল্য, এই লুণ্ঠন-নীতি বাংলাতে শুরু হলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও অনুরূপ পদ্ধতিতে টাকা সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হত।

(২) ব্যক্তিগত বাণিজ্য

১৭৫৭-১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর উপার্জন করে এবং তা ইংল্যাণ্ডে পাঠায়। ***ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ*** (Dr. N.K. Sinha) বলেন যে, উৎকোচ বা নজরানা অপেক্ষা কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত আয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১] ক্লাইভ, জনস্টন, সিনিয়র, লিসেস্টার, সাইকস্ প্রমুখ কপর্দকহীন অবস্থায় ভারতে এসে, দেশে ফিরেছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে। সাইকস্, ভেরেলেস্ট, বারওয়েল প্রমুখ কর্মচারীরা কয়েকটি অত্যাবশ্যক পণ্যের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ আয় করেন। বারওয়েল নিজেই স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশে অবস্থানকালে তিনি প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আয় করেন। মুর্শিদাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সাইকস্ মাত্র দু'বছরের মধ্যেই রোজগার করেন প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। এই সব কর্মচারীরা অবৈধভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে রাজার মতো জীবনযাপন করত এবং নিজেদের তারা *'ভারতীয় নবাব'* (Indian Naboobs) বলে অভিহিত করত।

(৩) কর্মচারীদের বেআইনি চুক্তি ও ঠিকাদারি

বিভিন্ন প্রকার গোপন ও অবৈধ চুক্তি এবং ঠিকাদারির মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা প্রচুর আয় করত। এ ব্যাপারে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন তুলনাহীন। তিনি স্বনামে, বেনামে বহু 'কনট্রাক্ট' নিয়েছিলেন। চার্লস গ্রান্ট, চার্লস ব্রান্ট, চার্লস ক্রাফট, জন সুলিভ্যান, জন বেলি প্রমুখ হেস্টিংসের প্রিয়পাত্ররাও পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা সাঁকো তৈরি, বাঁধ নির্মাণ, সেনাবাহিনীর পোশাক ও মাংস সরবরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের 'কনট্রাক্ট' নিয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করেন। ***কার্ল মার্কস*** লিখছেন যে, "অ্যালকেমিস্টদের (যারা কৃত্রিম সোনা তৈরি করতে পারেন) চেয়েও ধূর্ত এই প্রিয়পাত্ররা শূন্য থেকে সোনা তৈরি করত।"[২] *'বোর্ড অফ ট্রেড'* (Board of Trade)-এর সদস্যরাও নানা দুর্নীতির

মাধ্যমে অর্থ রোজগার করতেন। কোম্পানির মাল কেনার সময় তাঁরা গরিব চাষি, তাঁতি ও দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে বলপূর্বক কমিশন আদায় করতেন।

(৪) স্বাধীন বণিক

কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ডের কিছু স্বাধীন বণিক (Free Merchants)-কে এ দেশে বাণিজ্যের অনুমতি দেয়। এই সব লোভী ও দুর্নীতিপরায়ন স্বাধীন ব্যবসায়ীরা বাংলার চাষি, তাঁতি ও বণিকদের ওপর জুলুম করে ও ভয় দেখিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যাদি কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করত। ইংরেজ বণিকরা আবার এই মাল বেশি দামে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুঠত।

স্বাধীন বণিক ও কোম্পানির কর্মচারীদের স্বদেশে অর্থ প্রেরণ

কোম্পানির কর্মচারীরা এই বেআইনি অর্জিত অর্থ নানাভাবে স্বদেশে প্রেরণ করত। (১) ক্লাইভ, হেস্টিংস এবং কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা হীরে-জহরত ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর কিনে তা ইংল্যাণ্ডে পাঠাত এবং ইংল্যাণ্ডে সেগুলি বিক্রি করে নগদ অর্থে পরিণত করা হত। (২) কোম্পানির কর্মচারীরা *'বিল অফ এক্সচেঞ্জ'* মারফৎ-ও এই টাকা স্বদেশে পাঠাত। ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি বাণিজ্যের জন্য এ দেশে যে মালপত্র কিনত তার টাকা দিত ইংরেজ কর্মচারীরা। এতে তাদের সুবিধাই হয়েছিল কারণ মালপত্র কেনার জন্য তাদের আর দেশ থেকে সোনা-রূপা আনতে হত না। পরে এই কোম্পানিগুলি ইংল্যাণ্ডে সেই টাকা মিটিয়ে দিত। এতে বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল দু'ভাবে। একদিকে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছিল, আবার অন্যদিকে বিদেশি বণিকরা মালপত্র কিনবার জন্য পূর্বে যে সোনা-রূপা বাংলায় আনত, তা বন্ধ হয়ে যায়। (৩) কলকাতা ও বোম্বাই ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন ব্রিটিশ বাণিজ্যকেন্দ্র, যথা—জেদ্দা, এলেপ্পো, বসরা, কায়রো মারফৎ এই অর্থ স্বদেশে প্রেরিত হত। (৪) ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের পর ইংরেজ বণিকরা নিজেদের বাণিজ্য সংস্থা বা *'এজেন্সি হাউস'* গড়ে তোলে। এই এজেন্সি হাউসগুলি বণিকদের টাকা স্বদেশে পাঠাবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

কোম্পানির মাধ্যমে নিষ্কাশন

ইংরেজ কোম্পানির অনুসৃত নীতিও নানাভাবে সম্পদের নির্গমন ঘটাত। (১) পলাশির যুদ্ধের পূর্বে কোম্পানি ভারত থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করে তা ইওরোপের বাজারে বিক্রি করত। এই কেনাকাটাকে বলা হত *'ইনভেস্টমেন্ট'* (Investment) বা বিনিয়োগ। এ জন্য কোম্পানি নিজের দেশ থেকে সোনা-রূপা বা বুলিয়ান আমদানি করত। পলাশির যুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং নবাব তৈরির ব্যবসা, দেওয়ানি লাভ প্রভৃতির মাধ্যমে কোম্পানির হাতে প্রচুর অর্থ আসে। কোম্পানি এই অর্থই বাংলার বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে থাকে—'ইনভেস্টমেন্টের' জন্য স্বদেশ থেকে আর সোনা-রূপা আমদানির প্রয়োজন থাকে না। ***জেমস গ্রান্ট*** -এর মতে বছরে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এইভাবে বাণিজ্যিক লগ্নি মারফৎ বাংলার টাকা বাইরে চলে যেতে থাকে। (২) ইওরোপের বাজারে চীনের সবুজ চা ও সাদা রেশমের ব্যাপক চাহিদা থাকায় কোম্পানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলার সোনা-রূপা চীনে পাঠাতে থাকে। ১৭৬০-এ এর পরিমাণ ছিল বার্ষিক

২৪ লক্ষ টাকা। ১৭৭০-এ এর পরিমাণ কমে হয় ২০ লক্ষ টাকা। পরে বাংলা থেকে আফিং রপ্তানি করে চীনা বাণিজ্যের মূলধন সংগ্রহ করা হত। (৩) কোম্পানির অংশীদারদের *'ডিভিডেন্ট'* এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রাপ্য বাবদ কোম্পানি বাংলার রাজস্বের একটি বিরাট অংশ ইংল্যাণ্ডে পাঠাত। ***ডঃ যোগেশচন্দ্র সিংহ*** (Dr. J.C. Sinha) বলেন যে, ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০-র মধ্যে এই বাবদ বাংলা থেকে মোট ১ কোটি পাউন্ড ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়। (৪) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক ব্যয় এবং 'ইনভেস্টমেন্ট' বাবদ খরচও যেত বাংলার রাজস্ব থেকে। ***ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী*** -র মতে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই বাবদ গড়ে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বাংলা থেকে পাঠানো হতো। (৫) কোম্পানির রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধখাতে যে বিপুল ব্যয় হয় তার বিরাট অংশ যেত বাংলার রাজস্ব থেকে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলির মধ্যে চারটি মহীশূর যুদ্ধ, প্রথম মারাঠা যুদ্ধ এবং ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের কথা বলা যায়। (৬) এ ছাড়া, ভারতের মাথাভারি প্রশাসনিক কাঠামো, ইংরেজ কর্মচারীদের মোটা বেতন, ইংল্যাণ্ডের *'ইণ্ডিয়া অফিস'*-এর খরচ—সবই মেটানো হত বাংলার রাজস্ব থেকে।

নির্গমনের পরিমাণ

এইভাবে ভারত থেকে ঠিক কী পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ ইংল্যাণ্ডে গেছে তার পরিমাণ হিসেব করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে নানা পণ্ডিত নানা ধরনের হিসেব দিয়েছেন। ***যোগেশচন্দ্র সিংহ*** বলেন যে, ১৭৫৭-৮০ কালপর্বে ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে যায় ৩৮ কোটি ৪ লক্ষ পাউন্ড। ***স্যার পি. জে. গ্রিফিথ***-এর মতে ১৭৮০ থেকে ১৮১৩-র মধ্যে এই নির্গমনের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি পাউন্ড। ***হোল্ডেন ফারবার***-এর হিসেব অনুযায়ী ১৭৮৩-৯৩-এর মধ্যে এর পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ পাউন্ড। ***অধ্যাপক পি. জে. মার্শাল*** এ ব্যাপারে মোটামুটিভাবে বার্ষিক ৫ লক্ষ পাউন্ডের কথা বলেন। এ ব্যাপারে কোনও সঠিক হিসেব দেওয়া সম্ভব না হলেও এ কথা ঠিকই যে, এ সময় বাংলা তথা ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদের নির্গমন হয়েছিল। **মেজর উইনগেট** (Major Wingate) নামে জনৈক ইংরেজ দুঃখ করে বলেন যে, ভারত থেকে যে পরিমাণ টাকা ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়, তার কিছুই ভারতে খরচ করা হয় না। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সিলেক্ট কমিটির সভাপতি (পরে ভারতের গভর্নর জেনারেল) ***লর্ড এলেনবরা*** (Lord Ellenborough) বলেন যে, ভারত থেকে প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ পাউন্ড ব্রিটেনে আসে, কিন্তু বিনিময়ে ভারতকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম ভিন্ন অন্য কিছু দেওয়া হয় না। মাদ্রাজের রাজস্ব বোর্ডের সচিব ***জন সুলিভ্যান*** (John Sullivan) বলেন যে, "আমাদের শাসনব্যবস্থা অনেকটা স্পঞ্জের মতো। গঙ্গা-তীরবর্তী দেশ থেকে এই স্পঞ্জধর্মী শাসন যা কিছু সম্পদ সব শুষে নেয় এবং টেমস্-তীরবর্তী দেশে এনে তা নিঙড়ে দেয়।"[১] দাদাভাই নৌরজী ও রমেশচন্দ্র দত্তের রচনায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯০৫ খ্রীঃ)

◆ কংগ্রেসের বিকাশের পটভূমি ◆ কংগ্রেসের কার্যাবলী ◆ নরমপন্থী উদ্যোগের কারণসমূহ ◆

"The period from 1885 to 1905 was the seed time of Indian nationalism : and the early nationalist sowed the seeds well and deep...In spite of their many failures the early nationalists laid strong foundations for the national movement to grow up on and they deserve a high place among the makers of Modern India."

—Bipan Chandra

❖ প্রশ্ন (১) : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা কর।

■ **উত্তর :** ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব ঘটে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এলান অক্টোভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করলেও এবিষয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

● জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পেছনে হিউমের প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ বিরোধী ভারতীয়দের আন্দোলন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য 'সেফটি ভালভ' হিসেবে কংগ্রেসকে কাজে লাগানোই হিউমের উদ্দেশ্য ছিল। বিপানচন্দ্র বলেছেন, "The safety valve was transformed in a major channel for nationalist propaganda". তিনি ভেবেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া পূরণ করতে হলে কংগ্রেস গঠন করা দরকার। এবিষয়ে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে তিনি গোপন আলোচনা করেছিলেন। মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাফরিনের অনুমোদন পেয়েছিলেন। বামপন্থী ঐতিহাসিক **রজনীপাম দত্ত** বলেন **"হিউম ও ডাফরিনের মধ্যে ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি"** হল কংগ্রেস। ডঃ বি. এন পাণ্ডে তাঁর "The Break up of British India" গ্রন্থে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হিউম ও ডাফরিনের পরামর্শ

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **ডঃ পট্টভী সীতারামাইয়া** মন্তব্য করেছেন— (ক) ১৮৭৭ সালে দিল্লীতে যে **সর্বভারতীয় দরবার** হয়েছিল সেখানেই ভারতীয়দের মধ্যে কংগ্রেস গঠনের প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল। (খ) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় **সর্বভারতীয় প্রদর্শনী** হয়েছিল, তার থেকেই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেস গঠনের ধারণা জন্ম নেয়। (গ) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের আডিয়ার সমুদ্র উপকূলের কাছে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির এক বৈঠকে উপস্থিত ১৭ জন নেতা এক গোপন আলোচনার মাধ্যমে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত বলেন ঐ ১৭ জন নেতার অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। ডঃ সীতারামাইয়া কংগ্রেস গঠনের মূলে উপরোক্ত তিনটি কারণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, "We come to the conclusion that the idea was in the air, that the need of such an organisation was being felt."

সীতারামাইয়ার মত

● হিউমের জীবনীকার ঐতিহাসিক **উইলিয়াম ওয়েডার বার্ণ** বলেছেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান হিউম এক গোপন পুলিশ-রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের তীব্র আন্দোলনের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ছাত্রদের কাছে ১লা মার্চ ১৮৮৩ একটি **"খোলাচিঠি"** (Open letter) দিয়ে লিখেছিলেন, "ভারতীয় জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কংগ্রেস নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করা খুবই জরুরী।" ওয়েডার বার্ণের মতে এই পরিকল্পনা অনুসারেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়েডার বার্ণের মত

● অন্যদিকে **ডঃ বিপানচন্দ্রের** মতে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের **'ভারতসভা'** (১৮৭৬) জাতীয় কংগ্রেস গঠনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি ভারতসভা গঠনের পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সর্বভারতীয় অধিবেশন (All India national Conferance) আহ্বান করেছিলেন তার থেকেই ১৮৮৫-র জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

ভারতসভার প্রভাব

আবার দাদাভাই নৌরজীকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলে অনেকেই দাবী করেছেন। কিন্তু **দীনশা ওয়াচা** মনে করেন জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় নৌরজী নন হিউমই এর অন্যতম রূপকার। তবে **এ. সুব্রাহ্মণ্য আয়ার** জানিয়েছেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে উপস্থিত নেতাদের মাথায় সম্ভবত কংগ্রেস গঠনের ধারণা এসেছিল। অন্যদিকে **কর্ণেল এইচ. এস. অলকটের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি** কংগ্রেস গঠনের ধারণা দিয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।

থিয়োসফিস্টদের মতামত

● পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে কংগ্রেসের জন্ম হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মুজমদার পট্টভী সীতারামাইয়ার অভিমতকে গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর মতে কংগ্রেসের উদ্ভবের পটভূমিকা অন্যত্র খুঁজতে হবে। **কেমব্রিজ ঐতিহাসিক অনিল শীলের** মতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় লর্ড ডাফরিনের ভূমিকা নেহাত "মিথ বা অতিকথন" ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতিকালের **ঐতিহাসিক ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠীও** একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার যথার্থ পটভূমি নিয়ে আজও রহস্যের অবসান ঘটেনি। ঐতিহাসিক **পার্সিভাল স্পিয়ার** মনে করেন, **হিউম** ও **ডাফরিন** সতর্কতার সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করলেও তা কতটা **"সেফ্‌টিভালভ"** হিসেবে কাজ করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। **রজনীপাম দত্ত** বলেন, **হিউম, ডাফরিন** ও ব্রিটিশ আমলাদের ষড়যন্ত্রের ফলেই কংগ্রেস গঠিত হয়। তবে এবিষয়ে সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত আজও গৃহীত হয়নি।

মূল্যায়ন

শ্রমিক আন্দোলন (১৯১৮—১৯৩৪ খ্রীঃ)

◆ শ্রমিক আন্দোলন ◆

"In India the vast majority of workers get a wage which is not enough to provide them with the meanest necessities of life"– জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে (১৯৩৭) ভারতের প্রতিনিধি মিঃ এস. ভি. পারুলেকার এই মন্তব্য করেছিলেন।

❖ প্রশ্ন (১) : ***প্রবন্ধ রচনা কর : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে শ্রমিক আন্দোলন।*** [redacted]

অথবা, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বিবরণ দাও।

অথবা, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [redacted]

■ **উত্তর :** অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে। তারই প্রভাবে ভারতে শিল্পের সম্প্রসারণ শুরু হয় উনবিংশ শতকে। এইসময় থেকে শিল্প-কলকারখানা গঠনের পাশাপাশি শ্রমিক মালিক শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে দুটি **"কারখানা আইন"** কার্যকর হলে শ্রমিকের উপর মালিকের অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। অসন্তুষ্ট শ্রমিক শ্রেণী অত্যাচারী মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে **দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর** প্রেরণায় আসামের চা-বাগানে প্রথম ধর্মঘট পালন করে। দ্বারকানাথের লেখা 'Slave Trade in Assam' গ্রন্থে মালিকদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত আছে। তারপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে **শশীপদ ব্যানার্জীর 'ভারত শ্রমজীবী'** পত্রিকা ও **'শ্রমজীবী সমিতি'** নামক সংগঠন।

পটভূমি

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সাংবাদিক **নারায়ণ মেঘাজী লোখাণ্ডের 'দীনবন্ধু'** পত্রিকা ও **'বোম্বে মিল-হ্যাণ্ডস এ্যাসোসিয়েশন'** সংস্থা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের শ্রমিকরা দৈনিক মজুরীর দাবিতে ধর্মঘটে নামে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ছাপাখানার শ্রমিকরা বাড়তি কাজের জন্য বাড়াতি মজুরির দাবিতে একটানা ছয়মাস ধমর্ঘট পালন করেছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়। তবে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন তখনও গড়ে ওঠেনি।

● ভারতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ দিনে-দিনে বাড়তে থাকায় বোম্বে, মাদ্রাজ ও কলকাতাতে ব্যাপক ভাবে শিল্পায়ন ও শহরায়ন শুরু হয়। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক **রজনী পাম দত্ত স্যার জর্জ পেইনের** তথ্য উদ্ধৃত করে বলেন, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজি লগ্নীর পরিমাণ ছিল ৬৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ভারতের বিভিন্ন শহরে শিল্পের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার পাশাপাশি শ্রমিক শোষণ এবং শ্রমিক আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ফলে শিল্পের সম্প্রসারণ হলেও শ্রমিক অসন্তোষের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বিদেশী লগ্নীর প্রভাব

● স্বদেশী যুগে জাতীয়তাবাদী প্রচারে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চেতনা লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী, অশ্বিনী কুমার ঘোষ, লিয়াকৎ হোসেন, অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রেরণায় কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯০৬-১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে আসানসোল, খড়্গপুর, লিলুয়া, হাওড়া প্রভৃতি স্থানের রেলওয়ে ওয়ার্কশপে শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা ভারতের শ্রমিকদের চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বলেন, ভারতের শ্রমিকরা শুধু অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয় করেছিল। গান্ধীজি ও [illegible] সম্ভবত ১৮০০০ শ্রমিককে নিয়ে **"মজদুর মহাজন"** (১৯১৭) দল গঠন করেছিলেন। গান্ধীজি আমেদাবাদে মিল মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শ্রমিকদের ৮টি ঘণ্টা কাজের সময় সীমা, ন্যায্য মজুরী, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যার অনেকটা বিহিত করেছিলেন। আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের মত **'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে'** এবং **প্যারেলের** ওয়ার্কশপে মজুরীবৃদ্ধি ও কাজের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার দাবিতে প্রায় ৫০০০ শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘট পালন করে। ভারতের রাজনীতিতে আগমনের শুরুতেই শ্রমিক নেতা হিসাবে গান্ধীজির প্রভাব নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

স্বদেশী যুগে শ্রমিক ধর্মঘট

আমেদাবাদ মিল ধর্মঘট (১৯১৮)

● প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-'১৮) কারণে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্যাপকহারে শ্রমিকছাঁটাই, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক মন্দা ও অবশিল্পায়নের ফলে শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এইসময়ে ভারতে শ্রমিকসংখ্যা ছিল ১৮,৬৭,০০০। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা হল, যুদ্ধের খরচ মেটাতে সরকার এই শ্রমিকদের উপর ৫০% কর ধার্য করে। ফলে শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবন শোচনীয় হয়ে ওঠে। তাই বিখ্যাত শ্রমিক নেতা **বি. পি. ওয়াদিয়া 'মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন'** (১৯০৯) গঠন করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে সারাদেশে ১৯টি ধর্মঘট পালিত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বে, বাংলা, বিহার, আসাম, প্রভৃতি স্থানে ধর্মঘটি শ্রমিকেরা তীব্র আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। এইসময় (১৯০৯) শুধুমাত্র বোম্বের বিভিন্ন বস্ত্রশিল্পের ১,৫০,০০০ শ্রমিক একটানা এগারো দিন ধর্মঘট করে দাবি পূরণ করেছিলেন। **ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত** তাই মনে করেন, **"রুশ বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এক পূর্ণ কর্মতৎপরতার জগতে উন্নীত হয়। ভারতে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের সূচনায় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং এই সব আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সমানভাবে কাজ করেছিল।"** মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সংগঠন হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন : ওয়াদিয়া

● ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠনটি হল "অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" (All India Trade Union Congress বা AITUC)। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই জুলাই এই এ. আই. টি. ইউ. সি গঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি লালা লাজপৎ রায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, এ. আই. টি. ইউ. সি. হল "শ্রমিকদের জাগরণে এবং একটা যুগের অবসান ঘটিয়ে, আর একটি যুগের সূচনা করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।"* AITUC-এর দ্বিতীয় সভাপতি দেওয়ান **চমনলাল** স্পষ্টতই বলেন 'শ্রমিক শ্রেণীর জন্য স্বরাজ অর্জনই হল আমাদের উদ্দেশ্য। সভাপতির ভাষণে

AITUC গঠন (১৯২০)

* 'The awakening of the workers marked the end of an epoch and the beginning of another.'

দেওয়ানজী তাই বলেন, "...It was to be the Swaraj not for the Capitalists, but for the workers." এইভাবে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াতে আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল।

● গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০-২২) শ্রমিক আন্দোলন সর্বাত্মক রূপ নেয়। প্রথম দিকে AITUC-এর উদ্যোগে মোট ২০০টি শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয় (১৯২০)।

অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা

ঐ বছরে বোম্বেতে বস্ত্রশিল্পের ১২০টি ট্রেড ইউনিয়নের অধিন ২,৫০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে মিলিত হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় **৩৭৬টিতে** এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় **৪৫০টিতে**। এক পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন স্থানের ধর্মঘটে প্রায় ৪,০০,০০০ শ্রমিক এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৬,০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।

● শ্রমিক আন্দোলনের এই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার পশ্চাতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব তো ছিলই পরন্তু বহু বিশিষ্ট নেতাও আন্দোলনকে সর্বাত্মক করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাগণ

এদের বেশির ভাগ AITUC-র সদস্য ছিলেন। এইসব স্বনামধন্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, **যোশেপ ব্যাপ্তিস্তা, এন. এম যোশী, বি. পি. ওয়াদিয়া, নরিম্যান, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, মতিলাল নেহরু, সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং বাংলার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, জে. এন. ব্যানার্জী, হেমন্ত সরকার** প্রমুখ। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১ লা মে অন্ধ্রের বিখ্যাত শ্রমিকনেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার প্রথম ভারতে 'মে দিবস' (May Day) পালন করেছিলেন। তার আগে আমেরিকার চিকাগোতে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর আট ঘণ্টা কাজের সীমা বেঁধে দিতে। কিন্তু ভারতে মে দিবস পালনের পরও দেখা গেছে, পুলিশী নির্যাতন বেড়েছে এবং ২০% ধর্মঘটী শ্রমিকের ছাঁটাই হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাস্তবচিত্রটা সর্বদাই আলাদা ছিল। অনেক পরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে **"ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট"** পাশ হলে AITUC-এর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা আইনসিদ্ধ হয় এবং শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণ আইনগত স্বীকৃতি পায়।

মে দিবস পালন (১৯২৩)

মুজাফ্ফর আহমেদ

● ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মুজাফ্ফর আহমেদ কর্তৃক 'ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি' (C.P.I) গঠিত হলে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। কার্ল মার্ক্স-এর সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আদর্শে ভারতের কমিউনিষ্ট নেতারা সর্বহারা মেহনতী মানুষের শৃঙ্খল মোচনের জন্য শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে শ্রমিকদের প্ররোচিত করেন। কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে যে-সব প্রচার মাধ্যমগুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল মুজাফ্ফর আহমেদ সম্পাদিত **"গণবাণী"**; **শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গের "সোসালিষ্ট" সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের "কীর্তি" "লেবার কিষাণ গেজেট" ও "মজদুর কিষাণ", বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের "লাঙ্গল পত্রিকা"; সন্তোষকুমারী গুপ্তার "শ্রমিক"** ইত্যাদি। এছাড়া কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন **হেমন্ত সরকার, পি. সি. যোশী, মিরাজকর** প্রমুখ, যাঁদের অবদান শ্রমিক আন্দোলনকে সার্থক করে তুলেছিল।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা

● ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে **সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনকে** কেন্দ্র করে AITUC আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ লা মে বোম্বের ৫০,০০০ শ্রমিক সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হয় এবং সারা দেশে মে দিবস পালন করেন। ঐ বছর **সাপুরজী**

সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকদের সমর্থন

শাকলাৎওয়ালার ভাষণে শ্রমিকরা মালিকদের বিরুদ্ধে আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফলে ৪৫টি শ্রমিক ইউনিয়নের ১,৫০,০০০ সদস্য AITUC-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত AITUC-এর অধিবেশনে বলা হয়—ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যই হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ও শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে কংগ্রেসের চেয়ে শ্রমিক আন্দোলন ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক অনন্য সংযোজন।

● ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের গিরণী **কামগড় ইউনিয়নের** ১,৫০,০০০ সুতাকল-শ্রমিক লাগাতার ছয় মাস ধর্মঘট চালিয়ে যায়। ঐসময় ঐ ইউনিয়নের অন্য ৬০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২৫,০০০ শ্রমিক পুলিশের উৎপীড়ন সহ্য করে একটানা ২৬ দিন ধর্মঘট করে এবং তারা

১৯২৮-২৯ খ্রীঃ শ্রমিক আন্দোলন

কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের দাবি করে (ডিসেম্বর, ১৯২৮)। এইসময় সারা দেশের প্রায় ২০৩টি ধর্মঘটে প্রায় ৫,০০,০০০-এর বেশি শ্রমিক যুক্ত হয়েছিল। এর মধ্যে বস্ত্রশিল্পে ১১০টিতে ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। ঐ বছর হাওড়া ও লিলুয়া রেলের ধর্মঘটী পাঁচজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন **'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'** ধর্মঘটের দ্বারা বস্ত্রশিল্পগুলিকে প্রায় শেষ করে ছেড়েছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল, বিভিন্ন **জুট মিল** ও **'টিসকোর'** (TISCO) শ্রমিকরা সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটে সামিল

হুইটলি কমিশন (১৯২৯)

হয়েছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার জন্য মালিকরা সরকারী সহযোগিতায় শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করতে চাইলে শ্রমিকরা জঙ্গী আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে **হুইটলি কমিশনের** রির্পোটে ১/৩ ভাগ শ্রমিকের দৈন্যদশার কথা বলা হলেও সরকারের টনক নড়েনি। পরন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে **"ট্রেড ডিসপিউট বিল'** ও **'পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট'**-এর দ্বারা শ্রমিকের উপর পীড়নের মাত্রা আরো বাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল। এ দিকে **AITUC-এর 'ঝরিয়া অধিবেশনের** (১৯২৮) পর কমিউনিষ্টরা AITUC ত্যাগ করলেও আন্দোলনের গতি শ্লথ হয়ে পড়েনি।

● ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা মালিক ও সরকারী অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করেন। শ্রমিকদের আক্রমণে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হলে শোলাপুরের শ্রমিকনেতা **শ্রীকৃষ্ণ সারদা, কুরবান**

সশস্ত্র ও জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন

হোসেন, মালাপ্পা ধনেশেষ্ঠী ও **জগন্নাথ সিন্ধের** মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এদিকে ১৯২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার **ফজলুল হক 'বেঙ্গল প্রজা পার্টি'** গঠন করেন এবং কমিউনিষ্ট সংগঠন 'শ্রমিক ও কৃষক দল' (Workers and Peasants party) বাংলা, বোম্বে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে মালিক ও জমিদারী শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এইভাবে শ্রমিক আন্দোলন একসময় সশস্ত্র ও জঙ্গী আন্দোলনের রূপ নিলে সরকার প্রথম সারির বহু কমিউনিষ্ট নেতার [illegible] মিথ্যা অভিযোগ আনে।

● AITUC-র ঝরিয়া অধিবেশনের পর বহু কমিউনিষ্ট নেতা শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেও সরকার শ্রমিক আন্দোলনে মদত দেবার মিথ্যা অভিযোগ এনে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মার্চ মোট ৩৩ জন শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে **'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'** শুরু করে। চার বছরের বেশি কাল ধরে মামলা চলার পর **ডাঙ্গে, মিরাজকর, পি. সি. যোশী, গঙ্গাধর অধিকারী, ফিলিপ স্প্রাট বেঞ্জামিন, ব্রাডলে** প্রমুখ প্রত্যেকের দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস হয়। মামলার রায়ে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের গতিপথে ইহা একটি বড় আঘাত ছিল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-১৯৩৩)

● মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পরিপেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের গতি যখন ম্রিয়মান, ঠিক তখনই আন্দোলনকে পুনরুজীবিত করতে **জয়প্রকাশ নারায়ণ** ও **আচার্য নরেন্দ্রদেব** কমিউনিষ্ট ও কংগ্রেসী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে গড়ে তোলেন **'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল'** (Congress Socialist Party)। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকে মিলিত করতে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব। কংগ্রেসের **জওহরলাল নেহরু** ও **সুভাষচন্দ্র বসু** বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হলে **যমুনাদাস মেহেতা, ভি. ভি. গিরি** প্রতিষ্ঠিত **'ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'**-এর সঙ্গে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি যুগ্মভাবে শ্রমিক আন্দোলন শুরু করলে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। সমস্ত শিল্পপতিদের **"র‍্যাশানালাইজেশন স্কীম"** (Rationalisation Scheme, 1934)-এর বিরুদ্ধে এইভাবেশক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫৯টি ধর্মঘটে মোট ২,২০,৮০৮ জন শ্রমিকের অংশগ্রহণের ঘটনা প্রমাণ করে শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুত্থান-এর কথা।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠন (১৯৩৪)

● **ঐতিহাসিক সুমিত সরকার** বলেন, কংগ্রেস যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তাতে চরমপন্থী ধারার প্রবর্তন করেছিল শ্রমিক আন্দোলন। সেদিক থেকে শ্রমিক আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি প্রগতিশীল ধারা বলা চলে। সুভাষচন্দ্র বসু শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য ব্রিটিশ শাসনের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনে উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি সুভাষের এই রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহারকে নিন্দা করেছিলেন। কমিউনিষ্ট আদর্শে চালিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনে হিংসার প্রভাব বিশেষ ছিল না। তা সত্ত্বেও **বিড়লা কোম্পানীর** কাছে অপ্রিয় হওয়ার ভয়ে কংগ্রেস শ্রমিকদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারেনি। তাই **লুডাইট আন্দোলনের** মত ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হতে পারল না। তাহলেও অধ্যাপক সুমিত সরকার শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।'

মূল্যায়ন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভারত বিভাগ কি অনিবার্য ছিল? (Was Partition Inevitable?) ঃ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল এবং ভারত ও পাকিস্তান দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ভারত বিভাগ সত্যই অনিবার্য ছিল কিনা, তা একটি বহু বিতর্কিত ও বহু আলোচিত বিষয়।

অনেকেই বলেন যে ভারত বিভাগ অনিবার্য ছিল না—ইচ্ছে করলেই তা এড়ানো যেত। কয়েকজন নেতার ভুল এবং তাঁদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবই ভারত বিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। (১) ভারত ভাগের জন্য অনেক সময়েই জিন্নাকে দায়ী করা হয়। ***লিওনার্ড মোশলে*** বলেন যে, "পাকিস্তান হল মহম্মদ আলি জিন্নার একক অবদান।" কেবলমাত্র মোশলে-ই নন আরও অনেক ঐতিহাসিক এই মতামতই প্রকাশ করে থাকেন। (২) অনেকের মতে, ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতিই ভারত ভাগের জন্য দায়ী ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম হাতিয়ার 'Divide and Rule' নীতি অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তারা ভারত বিভাগ করে। (৩) অন্যদিকে ***রজনীপাম দত্ত, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এ. আর. দেশাই, ডঃ সুমিত সরকার*** প্রমুখ মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ এ জন্য জাতীয় কংগ্রেসের ওপর দোষারোপ করেন। ***রজনীপাম দত্ত*** ও ***হীরেন মুখোপাধ্যায়*** তো জাতীয় কংগ্রেসকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিতেও কসুর করেন নি। আসলে এই সব অভিযোগের কোনটিকেই পূর্ণ সত্য বলে আখ্যায়িত করা যুক্তিসম্মত হবে না।

দায়ী কে?

ভারত বিভাগে জিন্নার কিছুটা দায়িত্ব থাকলেও তিনিই সব নন বা একমাত্র দায়ী নন। একদা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' হিসেবে চিহ্নিত জিন্না কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং সত্যই তিনি পাকিস্তান চান নি—মৌলানা আজাদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের পাকিস্তানি ঐতিহাসিক ড. ***আয়েষা জালাল*** এই মত পোষণ করেন। গান্ধী, প্যাটেল, নেহরুর সঙ্গে যেমন তাঁর মতপার্থক্য ছিল, তেমনি সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বনিবনা ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান পরিকল্পনার দরাদরির মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করা। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর সরকার গঠনকালে মুসলিম লীগ তার দু'জন সদস্যকে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করার অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধ প্রত্যাখাত হলে জিন্না প্রবলভাবে কংগ্রেস-বিরোধী হয়ে ওঠেন। এ সম্পর্ক আর জোড়া লাগে নি—দিন দিন ব্যবধান বাড়তেই থাকে এবং তার শেষ পরিণাম ভারত বিভাগ।

জিন্না প্রসঙ্গ

কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় বিরোধই নয়—দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লীগ সমর্থক উদীয়মান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা টাটা-বিড়লার আধিপত্য মানতে রাজি ছিলেন না। অনুরূপভাবে নবাব, তালুকদার ও উচ্চশিক্ষিত মুসলিমরাও হিন্দু-প্রাধান্য মানতে চান নি। বাংলাদেশে মুসলিম বর্গাদারদের হিন্দু

মুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা

জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হয়। এইভাবে সাধারণ মুসলিমদের মন পাকিস্তান-মুখী করা অতি সহজ হয়।

ভারত বিভাগের জন্য ইংরেজদের 'Divide and Rule' নীতিকে দায়ী করা হয়। ইংরেজ শাসনের সূচনায় ইংরেজরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এবং পরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের তোষণ করতে থাকে। মুসলিম লীগ সৃষ্টিতে এবং ভারতে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলতে হয় যে, ইংরেজ শাসকবর্গ ভারত ভাগের বিরোধী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এটলী এবং বড়লাট মাউন্টব্যাটেন চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত, কিন্তু অবস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারত ভাগে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **এটলী** লেখেন যে, "আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতই চেয়েছিলাম। চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয় নি।"[১] বলা হয় যে মাউন্টব্যাটেন অত তাড়াহুড়ো না করে একটু ধৈর্য ধরে এগোলে হয়তো দেশভাগ এড়ানো যেত। বলা বাহুল্য, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা কখনই সম্ভব হত না—বড় জোর সময়ের কিছুটা হেরফের হতে পারত।

ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব

দেশভাগের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়। (১) বলা হয় যে, মৌলানা আজাদ ব্যতীত আর কোন নেতা সেভাবে দেশভাগের বিরোধিতা করেন নি। (২) বলা হয় যে, গান্ধীজি যদি দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে একাই আন্দোলনে নামতেন, তা হলে অসংখ্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁর পাশে দাঁড়াত। (৩) বলা হয় যে, জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে কংগ্রেস নেতাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং রণক্লান্ত এই সব নেতারা ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দেশভাগ মেনে নেন। (৪) মার্কসবাদী পণ্ডিতরা বলেন যে, কংগ্রেস ১৯৪৬-৪৭-এর গণ-বিদ্রোহে আতঙ্কিত হয়ে সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতা ভাগ করে নেয়। এ সময় কংগ্রেস যদি সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে সংহত করে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলত তাহলে ভারত বিভাগ এড়ানো যেত।

কংগ্রেস প্রসঙ্গ

বিভিন্ন মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা যেভাবে গান্ধীজি ও কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ড. ***অমলেশ ত্রিপাঠী***।(১) তিনি বলেন যে, ১৯৪২-এ যে কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সেই কমিউনিস্ট পার্টির কোন নৈতিক অধিকার নেই ১৯৪৫-৪৬-এ জাতীয় কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ না নেবার জন্য সমালোচনা করার।[২] (২) ড. ***ত্রিপাঠী*** বলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস যখন 'পাকিস্তান' প্রস্তাব বা আন্দোলনের বিরোধিতা করছিল এবং ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে গান্ধীজি যখন পাকিস্তানের গন্ধ পেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির অধিকারী-

কংগ্রেসের সমালোচনার জবাব

থিসিসে 'পাকিস্তান' আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। (৩) ১৯৪৫-৪৬-এ দেশের পরিস্থিতি কতটা বিপ্লবের অনুকূল ছিল এবং বিপ্লব করলে তা কতটা সফল হত, সে সম্পর্কেও ড. *ত্রিপাঠী* প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন যে তখন দেশ যদি সত্যই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকে তাহলে কমিউনিস্টরা সে দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে না তুলে নিয়ে কেন তা গান্ধীর ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে বলা দরকার যে গান্ধীজি কখনই সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। আর কংগ্রেস আন্দোলন করলেই যে ভারত ভাগ এড়ানো যেত তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে তখন অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে দেশভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া কংগ্রেসের সামনে কোন বিকল্প ছিল না।

বামপন্থী ঐতিহাসিক *ডঃ বিপান চন্দ্র* বলেন যে, "১৯৪৭-এ নেহরু, প্যাটেল ও গান্ধীজি শুধু যা অবশ্যম্ভাবী তাকেই মেনে নিয়েছিলেন।"[১] (১) লীগের কার্যকলাপ অন্তর্বর্তী সরকারে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করে লীগ মন্ত্রীগণ সরকারকে অকেজো করে দেন। পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ তখন এমন স্তরে পৌঁছায় যে তার সমাধান সম্ভব ছিল না। প্যাটেল অভিযোগ করেন যে, তখন বাংলা ও পাঞ্জাবে কার্যত একটি 'পাকিস্তান' সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। (২) সারা দেশজুড়ে তখন এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানি চলছিল যে তা বন্ধ করার একমাত্র উপায় ছিল দেশভাগ। অন্যথায় দেশ আরও বৃহত্তর হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ত। (৩) কেবলমাত্র পাকিস্তানের সমস্যা নয়—ভারতের অভ্যন্তরে তখন ছিল অসংখ্য দেশীয় রাজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যার সমাধান না হলে ভারত যে কতগুলি খণ্ডে বিভক্ত হত তার ঠিক নেই। (৪) কংগ্রেস মনে করেছিল যে দেশভাগ একটি সাময়িক ঘটনামাত্র। উত্তেজনার অবসানে মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে এবং দুর্বল পাকিস্তান নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আবার ভারতের সঙ্গে মিশে যাবে। বলা বাহুল্য, বাস্তবে তা হয় নি। *ডঃ বিপান চন্দ্র* বলেন যে, ১৯৪৬-এর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তার মোকাবিলা করার বা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ ছিল না। তা ছাড়া, নেতৃবৃন্দ চাননি যে দেশ আরও ব্যাপক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। সামরিক ও পুলিশ বাহিনী তখনও বিদেশী শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাদের অনেকেই আবার ধর্মের ভিত্তিতে পক্ষ বেছে নিয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিলেন।[২]

ডঃ বিপান চন্দ্রের মত

তাই বলা যায় যে, দেশভাগের জন্য কাউকেই পুরোপুরি দায়ী করা যায় না, বা কেউই সামান্যতম হলেও নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ***অন্নদাশঙ্কর রায়*** বলেন যে, "ইংরেজ ভাগ করে দিয়ে গেল এটা পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস ভাগ করিয়ে নিল, এটাও অনেকটা সত্য।...আমরা যেন জিন্নাকেই পুরোপুরি দায়ী না করি। ইংরেজকেও না।"